هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের "আল আসর" (اَلْعَصْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্‌সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এই সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এই একটি সূরাই তাদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিস্‌ন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)।

---

www.icsbook.info

আয়াত ৩ **সূরা আল 'আসর-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।[১]

১. এ সূরায় একথার ওপর সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারী ঃ (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য এখন এখানে প্রতিটি অংশের ওপর পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

কসম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব ও বিস্ময়করতার জন্য কখনো তার কসম খাননি।। বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম খেয়েছেন। কাজেই সময়ের কসমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত চারটি গুণাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, সময় এর সাক্ষী।

সময় মানে বিগত সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল আসলে কোন দীর্ঘ সময়ের নাম নয়। বর্তমান কাল প্রতি মুহূর্তে বিগত হচ্ছে এবং অতীতে পরিণত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বের হয়ে এসে বর্তমানে পরিণত হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেহেতু কোন বিশেষত্ব ছাড়াই শুধু সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে, তাই দুই ধরনের সময় বা কাল এর অন্তরভুক্ত হয়। অতীতকালের কসম খাওয়ার মানে হচ্ছে ঃ মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিচ্ছে, যারাই এই গুণাবলী বিবর্জিত ছিল তারাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর বর্তমানকালের কসম খাওয়ার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেণ্ডের কাঁটাটির চলার গতি লক্ষ করলে এই সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হবার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। অথচ একটি সেকেণ্ডও সময়ের একটি বিরাট অংশ। একমাত্র একটি সেকেণ্ডে আলো এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও থাকতে পারে যা এর চাইতেও দ্রুত গতি সম্পন্ন। তবুও ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেয়া হয় এবং যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজেও আমরা ব্যস্ত থাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবন কাল দেয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রাযী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেঁকে চলছিল— দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার একথা শুনে আমি বললাম, এটিই হচ্ছে আসলে وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ বাক্যের অর্থ। মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাবার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।" কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সূরায় যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবন কাল অতিবাহিত করে তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা বৈ কিছুই নয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যারা দুনিয়ায় কাজ করে একমাত্র তারাই লাভবান হয়। এটি ঠিক তেমনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষার হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে, তাকে আমরা হলের দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলি : এই দ্রুত গতিশীল সময় বলে দিচ্ছে, তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করছে একমাত্র সেই লাভবান।

মানুষ শব্দটি একবচন। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে একথাটি অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমগ্র মানব সম্প্রদায় এর মধ্যে সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে থাকবে না সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে। এটি ঠিক তেমনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমরা বলি, বিষ মানুষের জন্য ধ্বংসকর। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, বিষ সর্বাবস্তায় ধ্বংসকর হবে, এক ব্যক্তি খেলেও, একটি জাতি খেলেও বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মিলে খেলেও বিষের ধ্বংসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্তনীয়। এক ব্যক্তি বিষ খেয়েছে বা একটি জাতি বিষ খেয়েছে অথবা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিষ খাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফারাক দেখা যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য সূরায়

www.icsbook.info

উল্লেখিত চারটি গুণাবলী শূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি অকাট্য সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণাবলী শূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎকাজ করা এবং পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তরভুক্ত, অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। সাফল্য ও ক্ষতির কুরআনী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল 'আরাফ ৯ টীকা, আল আনফাল ৩০ টীকা, ইউনুস ২৩ টীকা, বনি ইসরাঈল ১০২ টীকা, আল হাজ্জ ১৭ টীকা, আল মু'মিনূন ১, ২, ১১ ও ৫০ টীকা এবং লোকমান ৪ টীকা, আয্ যুমার ৩৪ টীকা।) এই সংগে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আখেরাতে মানুষের সাফল্যই তার আসল সাফল্য এবং আখেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিণাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন নামূল ৯৯ টীকা, মারয়াম ৫৩ টীকা, ত্বা–হা ১০৫ টীকা) কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, "আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে," তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে, এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তখন এর অর্থ হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক।

এর প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। যদিও এ শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মায়েদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আত তাওবা ৩৮ আয়াত এবং

www.icsbook.info

আসসাফ ২ আয়াত) তবুও আসল ব্যবহার হয়েছে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে اٰمَنَ لَهٗ তার অর্থ হয় صَدَّقَهٗ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে) আর اٰمَنَ بِهٖ এর অর্থ হয় اَيْقَنَ بِهٖ (তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। কুরআন যে ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলে গণ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

اِنَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (আল হুজুরাত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।"

(হা-মীম আস সাজদাহ ৩০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"আসলে তারাই মু'মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।"

(আনফাল ২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ - (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"কাজেই, না (হে নবী!) তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মু'মিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফায়সালা করো সে ব্যাপারে তারা মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়।" (আন নিসা ৬৫)

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও প্রকৃত ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী করে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আসল লক্ষ হচ্ছে প্রকৃত ঈমান, মৌখিক স্বীকারোক্তি নয় ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (আন নিসা ১৩৬)

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাঁকে এমনভাবে মানা

www.icsbook.info

যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দূরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। ফেরেশতা, অন্যান্য নবীগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনাও এই রসূলের প্রতি ঈমান আনার অন্তরভুক্ত। কারণ আল্লাহর রসূলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ঈমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর ওপর একটি পাক-পবিত্র জীবনের ইমারত গড়ে উঠতে পারে। নয়তো যেখানে আদতে ঈমানের অস্তিত্বই নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্গর বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় সালেহাত। (صالحات) সমস্ত সৎকাজ এর অন্তরভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো 'সালেহাত' তথা সৎকাজের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ঈমান ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ঈমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া

www.icsbook.info

হয়েছে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে। এই সূরায়ও একথাটিই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঈমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত গুণগুলো তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সূরাটি আরো দু'টি বাড়তি গুণের কথা বলে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ গুণ দু'টি থাকা জরুরী। এ গুণ দু'টি হচ্ছে, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরস্পরকে হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান না করা উচিত। বরং তাদের সম্মিলনে একটি মু'মিন ও সৎসমাজদেহ গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত এই সমাজ যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। সাধারণত এ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একঃ সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। দুই ঃ আল্লাহর, বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পরকে হকের উপদেশ দেবার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন নয় যে, এখানে বাতিল মাথা উঁচু করতে এবং হকের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে থাকলেও লোকেরা তার নিরব দর্শক হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উঁচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, এই সমাজে এই প্রাণশক্তি সর্বক্ষণ প্রবাহিত থাকে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি, সত্য নীতি ও ন্যায় নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হকদারদের হক আদায় করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদেরকে এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ শক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা নিজেদের জায়গায় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নিরব থাকবে তারাও একদিন এই ক্ষতিতে লিপ্ত হবে। একথাটিই সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লানত করা হয়েছে। আর এই লানতের কারণ ছিল এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল (৭৮–৭৯ আয়াত) আবার একথাটি সূরা আরাফে এভাবে বলা বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩–১৬৬ আয়াত) সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ সেই ফিত্‌নাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব

www.icsbook.info

বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। (২৫ আয়াত)–এ জন্যই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উম্মাতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। (আলে ইমরান ১১০)

হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ–আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশ্‌ত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্ দাহর ১৬ টীকা এবং আল বালাদ ১৪ টীকা)।

www.icsbook.info

আল হুমাযাহ

১০৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের হুমাযাহ (هُمَزَةٍ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সকল মুফাস্‌সির একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী বিশ্লেষণ করলে এটিও রসূলের নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো জাহেলী সমাজে অর্থলোলুপ ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এই অসৎ-প্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সবাই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎগুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এই জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এই দু'টি বিষয় (অর্থাৎ একদিকে এই চরিত্র এবং অন্যদিকে আখেরাতে তার এই পরিণাম) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শ্রোতা নিজে নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন যে, এই ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে। আর যেহেতু দুনিয়ায় এই ধরনের চরিত্রের লোকেরা কোন শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায়, তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই।

সূরা যিলযাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সূরা চলে এসেছে এই সূরাটিকে সেই ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগে ইসলামী আকীদা– বিশ্বাস ও তার নৈতিক শিক্ষাবলী মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা মানুষ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের সমগ্র আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। সে দুনিয়ায় যে সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা গোনাহ করেছিল তা সেখানে তার সামনে আসবে না এমনটি হবে না। সূরা আদিয়াত–এ আরবের চতুর্দিকে যেসব লুটতরাজ, হানাহানি, খুনাখুনি ও দস্যুতা জারী ছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলোর এহেন অপব্যবহার তাঁর প্রতি বিরাট অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ

www.icsbook.info

অনুভূতি জাগ্রত করার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারটি এই দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না বরং মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হচ্ছে, সেখানে কেবল তোমাদের সমস্ত কাজেরই নয় বরং নিয়তও যাচাই বা পর্যালোচনা করা হবে। আর কোন ব্যক্তি কোন ধরনের ব্যবহার লাভের যোগ্য তা তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানে। সূরা আল কারিয়াহতে কিয়ামতের নকশা পেশ করার পর লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের নেকীর পাল্লা ভারী না গোনাহর পাল্লা ভারী হচ্ছে এরি ওপর নির্ভর করবে আখেরাতে তার ভালো বা মন্দ পরিণাম। যে বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ, আয়েশ-আরাম, ভোগ ও মর্যাদা বেশী বেশী করে অর্জন করার ও পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে সূরা তাকাসুরে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর এই গাফলতির অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে বলা হয়েছে—এ দুনিয়া কোন লুটের মাল নয় যে, তার ওপর তোমরা ইচ্ছামতো হাত সাফাই করতে থাকবে। বরং এখানে তুমি এর যেসব নিয়ামত পাচ্ছো তার প্রত্যেকটি কিভাবে অর্জন করেছো এবং কিভাবে ব্যবহার করেছো তার জন্য তোমার রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আসর-এ একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যদি মানবজাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমান ও সৎকাজ না থাকে এবং তার সমাজ ব্যবস্থায় হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবার রীতি ব্যাপকতা লাভ না করে, তাহলে তার প্রত্যেক ব্যক্তি, দেশ, জাতি এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করবে। এর পরপরই আসছে সূরা 'আল হুমাযাহ।' এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এই ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন?

www.icsbook.info

আয়াত ৯ | সূরা আল হুমাযাহ-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।[১] যে অর্থ জমায় এবং তা গুণে গুণে রাখে।[২] সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।[৩] কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায়[৪] ফেলে দেয়া হবে।[৫] আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কি? আল্লাহর আগুন,[৬] প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে।[৭] তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে[৮] (এমন অবস্থায় যে তা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।[৯]

১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ । আরবী ভাষায় এই শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে। এমন কি কখনো শব্দ দু'টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হয়। কিন্তু সে পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের যার ফলে একদল লোক "হুমাযাহ'র যে অর্থ করে, অন্য একদল লোক "লুমাযা"রও সেই একই অর্থ করে। আবার এর বিপরীত পক্ষে কিছু লোক "লুমাযাহ"র যে অর্থ বর্ণনা করে, অন্য কিছু লোকের কাছে "হুমাযাহ"র ও অর্থ তাই। এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং "হুমাযাহ" ও "লুমাযাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে

www.icsbook.info

দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২. প্রথম বাক্যটির পর এই দ্বিতীয় বাক্যটির থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশিত হয় যে, নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। অর্থ জমা করার জন্য جَمَعَ مَالًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে অর্থ প্রাচুর্য বুঝা যায়। তারপর 'গুণে গুণে রাখা' থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

৩. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

৪. মূলে হুতামা (حُطَمَة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হাত্ম (حَطْم) । হাত্ম মানে ভেঙ্গে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা টুকরা করে ফেলা। জাহান্নামকে হাত্ম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে।

৫. আসলে বলা হয়েছে لَيُنْبَذَنَّ । আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে نَبْذ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে আপনা আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের একমাত্র এখানে ছাড়া আর কোথাও জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি। এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতারই প্রকাশ হচ্ছে না। বরং এই সংগে এও জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ করে যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠে তাদেরকে আল্লাহ কেমন প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ কারণেই তিনি জাহান্নামের এই আগুনকে নিজের বিশেষ আগুন বলেছেন এবং এই আগুনেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. আসল বাক্যটি হচ্ছে, تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَة 'এখানে তাত্তালিউ' (تَطَّلِعُ) শব্দটির মূলে হচ্ছে 'ইত্তিলা' (اطلاع) 'ইত্তিলা' এর একটি অর্থ হচ্ছে চড়া, আরোহণ করা ও ওপরে পৌঁছে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অবগত হওয়া ও খবর পাওয়া। আফ্‌ইদাহ্ (اَفْئِدَة) হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন ফুওয়াদ (فواد) এর মানে হৃদয়। কিন্তু বুকের মধ্যে যে হৃদপিণ্ডটি সবসময় ধুক ধুক করে তার জন্যও ফুওয়াদ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বরং মানুষের চেতনা, জ্ঞান, আবেগ, আকাংক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্রস্থলকেই এই শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছবার একটি

www.icsbook.info

অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা, ভুল আকীদা–বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে।

৮. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না।

৯. ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ (فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) এর একাধিক মানে হতে পারে। যেমন এর একটি মানে হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আগুনের শিখাগুলো লম্বা লম্বা থামের আকারে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে।

---

www.icsbook.info

আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের আসহাবিল ফীল (اَصْحٰبِ الْفِيْلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মু'আযযমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টীকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়পিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কনস্টান্টিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিছক ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূলে আসল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খুনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এই ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অব্দে কাইজার আগাষ্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম

www.icsbook.info

উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র স্থলপথ উন্মুক্ত থেকে যায়। এই স্থলপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত্ব দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্রাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের "আস্ সুমাইফি আশ্ওয়া" যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দেবার অংগীকার করে এবং হাবশা সম্রাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্ণর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এই সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এই সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।)

এ ব্যক্তি ধীরে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াস্তে হাবশা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্রাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদ্দে মাআরিব–এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে রোমের কাইজার,

www.icsbook.info

ইরানের বাদশাহ, হীরার বাদশাহ এবং গাস্‌সানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সন্দে মাআরিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সংরক্ষিত রয়েছে। এই শিলালিপি আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে। গ্লীসার (Glaser) তার গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টীকা)।

এই অভিযান শুরুর গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খৃষ্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মজবুত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্‌আ'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুল্লাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এই সংকল্পের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কাবাঘর ধ্বংস করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোন লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এই ধরনের কোন কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি

* ইয়ামনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা মক্কার কা'বাঘরের মোকাবিলায় দ্বিতীয় একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরুজের ৪ টীকায় এর আলোচনা এসেছে।

www.icsbook.info

করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যেকোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌছল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, কা'বাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু-নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশ'আম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশংকাও করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি ভাঙতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস নামক স্থানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। —তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগাম্মেস থেকে আবরাহা তার অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দূতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এই মর্মে বাণী পাঠায় ঃ আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এই ঘরটি (কাবা) ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির কোন ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দূতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলে, আপনি আমার সাথে

www.icsbook.info

আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তাবিল বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা) ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নু'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌঁছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর ওপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অস্বীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হাযির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া

www.icsbook.info

ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকটকালে তারা সবাই এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত ওঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لَا هُمَّ ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।"

لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

"আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।"

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدالك

"যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।"

সুহাইলী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وانصرنا على ال الصليب وعابديه اليوم الك

"ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মোকাবিলায়
আজ নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

يارب لا ارجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاداكا امنعهم ان يخربوا قراكا

"হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এই ঘরের শত্রু তোমার শত্রু,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।"

এ দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথিরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল

www.icsbook.info

সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাঁট দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অংকুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সংগে সংগেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোন রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সংগে সংগে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আব্বাস (রা) আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং যেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়োহুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ'আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে ঃ

اين المفرو الاله الطالب والا شرم المغلوب ليس الغالب

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পশ্চাদ্ধাবন?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।"

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাশ'আম এলাকায় পৌঁছে মারা যায়।*

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত্ব পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইবনে যী ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

www.icsbook.info

মুয্দালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআত্তায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাটাই অবস্থান স্থল। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

رُدَيْنَةُ لور أيتِ ولا تَريه لدَى جنب المحصَّب مارأينا

حمدت اللّٰه اذا بصرت طيرًا وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسئال عن نفيل كأنّ على للجشان دَينا

"হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা।
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শংকিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপরও।
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।"

এটা একটা মস্তবড় ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোন একটি কবিতাতেই ইশারা–ইংগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে যিবা'রা বলেন ঃ

ستّون الفالم يؤبوا ارضهم ولم يعش بعد الاياب سقيمها

كانت بها عادوجرهم قبلهم واللّٰه من فوق العباد يقيمها

www.icsbook.info

"ষাট হাজার ছিল তারা
ফিরতে পারেনি নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে,
আর ফেরার পরে তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহুম,
আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর রয়েছেন,
তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।"

আবু কায়েস ইবনে আস্‌লাত তার কবিতায় বলেন ঃ

فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا بار كان هٰذا البيت بين الاخاشب

فلما اتاكم نصرذى العرشى ردّهم جنود الملیك بين ساف وحاصب

"ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
বাইতুল্লার কোণগুলো স্পর্শ করো।
আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌঁছুল তোমাদের কাছে
তখন সেই বাদশাহর সেনাবাহিনী
তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়–
তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্তিকার পরে
আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন।"

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত উম্মে হানী (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (র) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কুরাইশরা ১০ বছর (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হযরত যুবাইরের (রা) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে মুরসাল রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূলের (সা) জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে।

www.icsbook.info

মূল বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পুরানো ছিল না। মক্কার সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোন দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাটিও ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

www.icsbook.info

আয়াত ৫ **সূরা আল ফীল-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ ۝٥

তুমি কি দেখনি[১] তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?[২] তিনি কি তাদের কৌশল[৩] ব্যর্থ করে দেননি?[৪] আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান,[৫] যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।[৬] তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।[৭]

১. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূলত এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজীদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখনি?) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। (উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন ঃ ইবরাহীম ১৯ আয়াত, আল হাজ্জ ১৮ ও ৬৫ আয়াত, আন নূর ৪৩ আয়াত, লোকমান ২৯ ও ৩১ আয়াত, ফাতের ২৭ আয়াত এবং আয্ যুমার ২১ আয়াত) তাছাড়া দেখা শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে এবং আরবের বিস্তৃত এলাকায় এ আসহাবে ফীলের ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এ ধরনের বহু লোক সে সময় জীবিত ছিল। কারণ তখনো এই ঘটনার পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি। লোক মুখে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সরাসরি এত বেশী বেশী সূত্রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে এটা প্রায় সব লোকেরই চোখে দেখা ঘটনার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

২. এই হাতিওয়ালা কারা ছিল, কোথায় থেকে এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এসব কথা আল্লাহ এখানে বলছেন না। কারণ এগুলো সবাই জানতো।

www.icsbook.info

৩. মূলে কাইদা (كَيْد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করবার জন্য গোপন কৌশল অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে গোপন কি ছিল? ষাট হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী কয়েকটি হাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসে। তারা যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলতে এসেছে, একথাও তারা গোপন করেনি। কাজেই এ কৌশলটি গোপন ছিল না। তবে হাবশীরা কা'বা ভেঙে ফেলে কুরাইশদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যদস্ত করে এবং এভাবে সমগ্র আরববাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটিকে তারা গোপন করে রাখে। অন্যদিকে তারা প্রকাশ করতে থাকে কয়েকজন আরব তাদের গীর্জার যে অবমাননা করেছে, কা'বা শরীফ ভেঙে ফেলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

৪. মূলে বলা হয়েছে فِىْ تَضْلِيْلٍ অর্থাৎ তাদের কৌশলকে তিনি ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কৌশলকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করার মানে হয় তাকে নষ্ট ও বিধ্বস্ত করে দেয়া অথবা নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির তীর লক্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা ও কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায় বলা হয়েছে وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ "কিন্তু কাফেরদের কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে।" (আল মু'মিন ২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ "আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদের কৌশলকে সফলতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন না।" (ইউসুফ ৫২) আরববাসীরা ইমরাউল কায়েসকে اَلْمَلِكُ الضِّلِّيْلُ "বিনষ্টকারী বাদশাহ" বলতো। কারণ সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছিল।

৫. মূলে বলা হয়েছে طَيْرًا اَبَابِيْلَ আরবীতে আবাবীল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবার পশুও হতে পারে। ইকরামা ও কাতাদাহ বলেন, লোহিত সাগরের দিক থেকে এ পাখিরা দলে দলে আসে। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামা বলেন, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং এর পরেও দেখা যায়নি। এগুলো নজদ, হেজায, তেহামা বা লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকার পাখি ছিল না। ইবনে আব্বাস বলেন, তাদের চঞ্চু ছিল পাখিদের মতো এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। ইকরামার বর্ণনা মতে তাদের মাথা ছিল শিকারী পাখীর মাথার মত। প্রায় সকল বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে ছিল একটি করে পাথরের কুচি এবং পায়ে ছিল দু'টি করে পাথরের কুচি। মক্কার অনেক লোকের কাছে এই পাথর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আবু নু'আইম নওফাল ইবনে আবী মু'আবীয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবে ফীলের ওপর যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল আমি তা দেখেছি। সেগুলোর এক একটি ছিল ছোট মটর দানার সমান। গায়ের রং ছিল লাল কালচে। আবু নু'আইম ইবনে আব্বাসের যে রওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল চিলগুজার* সমান। অন্যদিকে ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে, সেগুলো ছিল ছাগলের লেদীর সমান। মোটকথা, এসবগুলো পাথর সমান মাপের ছিল না। অবশ্যি কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল।

* চিলগুজা চীনাবাদাম জাতীয় এক ধরনের শুকনা ফল। লম্বায় ও চওড়ায় একটি চীনাবাদামের প্রায় সমান।

www.icsbook.info

৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। ইবনে আব্বাস বলেন, এ শব্দটি মূলত ফারসীর "সংগ" ও "গীল" শব্দ দু'টির আরবী করণ।* এর অর্থ এমন পাথর যা কাদা মাটি থেকে তৈরি এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ থেকেও এই অর্থের সত্যতা প্রমাণ হয়। সূরা হূদের ৮২ ও সূরা হজুরাতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, লূত জাতির ওপর সিজ্জীল ধরনের পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং এই পাথর সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল মাটির পাথর অর্থাৎ কাদামাটি থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

মাওলানা হামীদুদ্দিন ফারাহী মরহুম ও মগফুর বর্তমান যুগে কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি এ আয়াতে "তারমীহিম" (তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল) শব্দের কর্তা হিসেবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আরববাসীদেরকে চিহ্নিত করেছেন। "আলাম তারা" (তুমি কি দেখনি) বাক্যাংশেও তাঁর মতে এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। পাখিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা পাথর নিক্ষেপ করছিল না বরং তারা এসেছিল আসহাবে ফীলের লাশগুলি খেয়ে ফেলতে। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তার নির্যাস হচ্ছে এই যে, আবদুল মুত্তালিবের আবরাহার কাছে গিয়ে কা'বার পরিবর্তে নিজে উট ফেরত নেবার জন্য দাবী জানানোর ব্যাপারটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কুরাইশরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য এসেছিল তারা হানাদার সেনাদলের কোন মোকাবেলা না করে কাবাঘরকে তাদের করুণা ও মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে, একথাও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাই তাঁর মতে আসল ঘটনা হচ্ছে, আরবরা আবরাহার সেনাদলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত করে এই সেনাদলকে বিধ্বস্ত করেন। তারপর তাদের লাশ খেয়ে ফেলার জন্য পাখি পাঠান। কিন্তু ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবদুল মুত্তালিব তার উট দাবী করতে গিয়েছিলেন, রেওয়ায়াতে কেবল একথাই বলা হয়নি। বরং রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের দাবীই জানাননি এবং আবরাহাকে তিনি কাবা আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা একথাও বলেছি, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবরাহা মহররম মাসে এসেছিল। তখন হাজীরা ফিরে যাচ্ছিল আর একথাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করা কুরাইশদের ও তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোর সামর্থের বাইরে ছিল। আহযাব যুদ্ধের সময় বিরাট ঢাক ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরব মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোর যে সেনাদল তারা এনেছিল তার সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস তারা কেমন করে করতে পারতো? তবুও এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে যদি শুধু মাত্র সূরা ফীলের বাক্য বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এ ব্যাখ্যা তার বিরোধী প্রমাণিত হয়। আরবরা পাথর মারে এবং তাতে আসহাবে ফীল মরে ছাতু হয়ে যায় আর তারপর পাখিরা আসে তাদের লাশ খাবার জন্য, ঘটনা যদি এমনি ধরা হতো তাহলে বাক্য বিন্যাস হতো নিম্নরূপভাবে ঃ

* সংগ মানে পাথর এবং গীল মানে কাদা।–অনুবাদক

www.icsbook.info

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ ـ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ

(তোমরা তাদেরকে মারছিলে পোড়া মাটির পাথর। তারপর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন ভুক্ত ভূষির মতো। আর আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন) কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রথমে আল্লাহ পাখির ঝাঁক পাঠাবার কথা জানালেন তারপর তার সাথে সাথেই বললেন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ যারা তাদেরকে পোড়া মাটির তৈরী পাথরের কুচি দিয়ে মারছিল। সবশেষে বললেন, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভুক্ত ভূষির মতো করে দিলেন।

৭. আসল শব্দ হচ্ছে, كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ আসফ শব্দ সূরা আর রহমানের ১২ আয়াতে এসেছে ঃ وَالْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ "শস্য ভূষি ও চারাওয়ালা।" এ থেকে জানা যায়, আসফ মানে হচ্ছে খোসা, যা শস্য দানার গায়ে লাগানো থাকে এবং কৃষক শস্য দানা বের করে নেবার পর যাকে ফেলে দেয় তারপর পশু তা খেয়েও ফেলে। আবার পশুর চিবানোর সময় কিছু পড়েও যায় এবং তার পায়ের তলায় কিছু পিশেও যায়।

---

www.icsbook.info

কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْش) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহ্হাক ও কাল্‌বী একে মাদানী বললেও মুফাস্‌সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সূরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাঘরের-জন্য "এ ঘর" শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোন কোন মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর (রা) একবার কোন ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এই সূরা দু'টি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভংগী পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজাযে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এ জন্য কুসাইকে "মুজাম্মে" বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মান্নাফ ও আবদুদ্‌দারের

www.icsbook.info

মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মান্নাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবদে মান্নাফের ছিল চার ছেলে ঃ হাশেম, আবদে শামস, মুত্তালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুত্তালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সংগে আরববাসীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্ররা তাদের কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটরা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়তি সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এই পরিকল্পনায় তার অন্য তিন ভাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাসসানী বাদশাহ থেকে, আবদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুত্তালিব ইয়ামনের গভর্ণরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার ভাই "মুত্তাজিরীন" বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে "আসহাবুল ঈলাফ" তথা প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোন গোত্র তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কা পরিণত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তী কালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোন গোত্রে কুরাইশদের মতো এত বেশী লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ

www.icsbook.info

অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ ঃ আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِى قُرَيْشٍ

"প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।"

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কা'বা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কা'বা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এই বিশ্বাসের ভিত্ও নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। হাবশীদের মক্কা দখল করার পর রোম সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চাইতেও মারাত্মক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কা'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মজবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপত্তি আগের চাইতেও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নির্বিঘ্নে আরবের যে কোন অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোন এলাকা অতিক্রম করতো। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোন অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট্ট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

www.icsbook.info

আয়াত ৪ **সূরা কুরাইশ-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ
هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে,[১] (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত।[২] কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত,[৩] যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন[৪] এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ । এখানে ঈলাফ (ايلاف) শব্দটি এসেছে উলফাত (الفت) শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। ঈলাফ শব্দের পূর্বে যে 'লাম'টি ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী প্রচলন ও বাকরীতি অনুযায়ী এর মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করা বুঝায়। যেমন আরবরা বলে, لِزَيْدٍ وَمَا صَنَعْنَا بِهٖ "এই যায়েদের ব্যাপারটা দেখো, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু সে আমাদের সাথে কেমন ব্যবহারটা করলো।" কাজেই لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ মানে হচ্ছে, কুরাইশদের ব্যবহারে বড়ই অবাক হতে হয়। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হবার পর একত্র হয়েছে এবং এমন ধরনের বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যা তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা সেই আল্লাহর বন্দেগী করতে অস্বীকার করছে! ভাষাতত্ত্ববিদ আখ্‌ফশ, কিসাঈ ও ফাররা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর এ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন, আরবরা যখন এ 'লাম' ব্যবহার করে কোন কথা বলে তখন সেই কথাটি এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, একথার পরও যে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তা বিস্ময়কর। বিপরীতপক্ষে খলীল ইবনে আহমদ, সিবওয়াইহে ও যামাখ্‌শারী প্রমুখ ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ বলেন, এখানে লাম অব্যয় সূচক এবং এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আগের বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এর সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ।

www.icsbook.info

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরের মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীত প্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরবের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা।

৩. এ ঘর মানে কা'বা শরীফ। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাই একথা মেনে নিয়েছে যে, এই যে ৩৬০টি মূর্তিকে তারা পূজা করে এরা এ ঘরের রব নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই এর রব। তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল। তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র। কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে। সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে। কাজেই তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে। কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদাত করা উচিত।

৪. মক্কায় আসার পূর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে। তাদের সপক্ষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন—'হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিয়ো, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করো।' (সূরা ইবরাহীম ৩৭) তাঁর এই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

৫. অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। নিজের গোত্রের সীমানার বাইরে পা রাখার সাহস কোন ব্যক্তির ছিল না। কারণ একাকী কোন ব্যক্তির জীবিত ফিরে আসা অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামে পরিণত হবার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া যেন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোন কাফেলা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারতো না। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তার ওপর ছিল দস্যু দলের আক্রমণের ভয়। ফলে পথ-পার্শ্বের প্রভাবশালী গোত্র সরদারদেরকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাগুলো দস্যু ও লুটেরাদের হাত থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানারপর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। এমন কি একজন কুরাইশী একাই যদি কখনো কোন জায়গায় যেতো এবং সেখানে কেউ তার ক্ষতি করতে যেতো তাহলে তার পক্ষে শুধুমাত্র হারমী (حرمى) বা انا من حرم الله আমি হারম শরীফের লোক বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। একথা শুনার সাথে সাথেই আক্রমণকারীর হাত নিচের দিকে নেমে আসতো।

www.icsbook.info

আল মাউন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের বার্তা শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরূহ ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ভয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভুক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ-মুসিবতের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবূতের ১০-১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩-১৬ টীকা)

www.icsbook.info

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি–পুরস্কার ও পাপ–পূণ্যের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

www.icsbook.info

আয়াত ৭ **সূরা আল মাউন-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

তুমি কি তাকে দেখেছো[১] যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে[২] মিথ্যা বলছে?[৩] সে-ই তো[৪] এতিমকে ধাক্কা দেয়[৫] এবং মিসকিনকে খাবার দিতে[৬] উদ্বুদ্ধ করে না।[৭] তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস,[৮] যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে,[৯] যারা লোক দেখানো কাজ করে[১০] এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি[১১] (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. 'তুমি কি দেখেছো' বাক্যে এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।" অর্থাৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, "এ দিকটাও তো একবার দেখো।" এর অর্থ হয়, "এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো।" কাজেই "আরাআইতা" (أَرَءَيْتَ) শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জানো সে কেমন লোক যে শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলে?" অথবা "তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?"

২. আসলে বলা হয়েছে : يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ । কুরআনের পরিভাষায় "আদ্ দীন" শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

www.icsbook.info

সামনের দিকে যে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অর্থটিই বেশী খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিও খাপছাড়া নয়। ইবনে আব্বাস (রা) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আখেরাত অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে দীন ইসলামের নৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট করাটাই সমগ্র সূরাটির মূল বক্তব্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ দীন অস্বীকারকারীদের মধ্যে যে চরিত্র ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় ইসলাম তার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করার উদ্দেশ্য একথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো কি না। বরং আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকার করার মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে শ্রোতাকে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এই সংগে কোন্ ধরনের লোকেরা এ আকীদাকে মিথ্যা বলে সে কথা জানার আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করবে।

৪. আসলে فَذٰلِكَ الَّذِىْ বলা হয়েছে। এ বাক্যে فَ অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করছে। এর মানে হচ্ছে, "যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তুমি জেনে নাও," "সে-ই তো সেই ব্যক্তি" অথবা এটি এ অর্থে যে, "নিজের এ আখেরাত অস্বীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে ....."

৫. মূলে يَدُعُّ الْيَتِيْمَ বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। এক, সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দুই, এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিন, সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আত্মীয় এতিম থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির ও বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এবং কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ নীতি অবলম্বন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আলামুন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে

www.icsbook.info

বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, "যা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সংগে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন–সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু'জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম! আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সাজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়–সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের ওপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া ৫ টীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জবরদস্ত নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মূর্ত প্রকাশ।

৬. اَطْعَامِ الْمِسْكِيْنِ নয় বরং طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বলা হয়েছে "ইত্'আমুল মিসকিন" বললে অর্থ হতো," সে মিসকিনকে খানা খাওয়াবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। কিন্তু "তাআমুল মিসকিন" বলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে, "সে মিসকিনকে খানা দিতে উৎসাহিত করে না।" অন্য কথায়, মিসকিনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসকিনেরই খাবার। তা ঐ মিসকিনের হক এবং দাতার ওপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এটা মিসকিনকে দান করছে না বরং তার হক আদায় করছে। সূরা আয্ যারিয়াতের ১৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "আর তাদের ধন সম্পদে রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক।"

www.icsbook.info

৭. لَا يَحُضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো।

এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অস্বীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিক অসৎবৃত্তির জন্ম দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো দু'টো দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সৎবিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে শব্দ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে "ফা" (ف) ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্যে যারা আখেরাত অস্বীকার করে তাদের অবস্থা তুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শামিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

"মুসাল্লীন" মানে নামায পাঠকারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হওয়া।

৯. فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ যদি বলা হতো "ফী সালাতিহিম" তাহলে এর মানে হতো, নিজের নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীতে

www.icsbook.info

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ মানে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযের থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র পড়ে থাকে। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কোননা কোন প্রকারে নামায পড়ার তান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিটাও তাদের থাকে না। মুয়াযযিনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথাকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরস্কার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এ জন্য হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেন ঃ আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহুন" বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালাতিহিম সাহুন।" অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তরভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।" (তাওবা ৫৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تِلْكَ صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر اربعا لايذكر الله فيها الا قليلا -

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের

www.icsbook.info

মাঝখানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল) হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে নামাযের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস্ সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মু'মিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডংকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন না কোনভাবে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে,

www.icsbook.info

যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না।" অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে," একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিশ শু'আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا –

"আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসাত্গ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন (ماعون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহ্হাক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ আতা ও যুহরী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবরাহীম নাখয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস–পত্র যেমন, হাড়ী–পাতিল, বালতী, দা,–কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, চকমাকি(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হযরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম) ঃ মাউন বলতে হাঁড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঁড়িপাল্লা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায্যার, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান) সাঈদ ইবনে ইয়ায স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একথা শুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু'আইম হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

www.icsbook.info

মূলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তরভুক্ত। এ জিনিসগুলো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন আপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী-গরীব সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় দরকার হয়। অবশ্যি এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই তা ফেরত দেয়। কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা-বালিশ চাওয়াও এ মাউনের অন্তরভুক্ত। অথবা নিজের প্রতিবেশীর চুলায় একটু রান্নাবান্না করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অন্যের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়াও মাউনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এখানে আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি মানুষকে এতবেশী সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, সে অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না।

---

www.icsbook.info

আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাওসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কাল্‌বী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর ইতকান গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই লোকদের বললেন ঃ এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাওসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাওসার কি? সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন ঃ সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জান্নাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস (রা) মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস (রা) থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জান্নাতের এ নহরটি (কাওসার), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজে দেখানো হয়েছিল। আর সবাই জানেন মি'রাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মি'রাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাওসার নাযিল করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত

www.icsbook.info

যদি হযরত আনাসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার খবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব? অন্যদিকে মুফাস্‌সিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে কিছু বলছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন ঃ আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাস্‌সিরগণ কোন কোন আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দু'বার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন সময় অহীর মাধ্যমে নবীর (সা) দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোন আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আয্‌যমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ-এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য মহান আল্লাহ বহু আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"আর অবশ্যি তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।"

www.icsbook.info

অন্যদিকে আলাম নাশরাহে বলেন : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি তোমার আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ শত্রু সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উজ্জ্বল করার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই সাথে আরো বলেন : فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিশ্চিন্তভাবেই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।" অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্রই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বান্ধবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে بتر محمد منا অর্থাৎ "মুহাম্মাদ নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।" (ইবনে জারীর) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো : "সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা। কোন ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।" শিমার ইবনে আতীয়্যার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। (ইবনে জারীর) ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদি সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে :

اَلاَ تَرَى اِلَى هٰذَا الصَّبِيِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهٖ يَزْعَمُ اَنَّهٗ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ اَهْلُ الْحَجِيْجِ وَاَهْلُ السِّدَانَةِ وَاَهْلُ السِّقَايَةِ -

"এ ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।" (বাযযার)

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে الصنبور النبتر من قومة বলে অভিহিত করতো। অর্থাৎ "তিনি এক অসহায়, বন্ধু-বান্ধবহীন, দুর্বল ও নিসন্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।" (ইবনে জারীর) ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম (রা) তার ছোট ছিলেন হযরত যয়নব(রা)। তার

www.icsbook.info

ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিন কন্যা; হযরত উম্মে কুলসুম (রা), হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত রুকাইয়া (রা)। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম মারা যান হযরত কাসেম। তারপর মারা যান হযরত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, "তার বংশই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এই বক্তব্য এসেছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لَا اِبْنَ لَهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَاِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ –

"মুহাম্মাদ একজন শিকড় কাটা। তার কোন ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তার ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া) দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এই "সুখবর" দেয় ঃ بَتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيْلَةَ অর্থাৎ রাতে মুহাম্মাদ সন্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তার শিকড় কেটে গেছে।"

এ ধরনের চরম হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সূরা কাউসার নাযিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশরা ছিল তাঁর প্রতি বিরূপ। এ জন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রকম জ্ঞাতি–গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু–বান্ধব ও সহায়–সম্বলহীন। তাঁরাও জুলুম–নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর ওপর যেন দুঃখ ও শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় আত্মীয়–স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাত্মীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছোট্ট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যার চাইতে বড় সুখবর দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিন দেয়া হয়নি। এই সংগে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

www.icsbook.info

আয়াত ৩ **সূরা আল কাউসার-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

(হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।[১] কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।[২] তোমার দুশমনই[৩] শিকড় কাটা।[৪]

১. কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন ভাষায়ও এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত। كثرة থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য। ভূমিকায় আমি এ সূরার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলানো প্রয়োজন। তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুরা মনে করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছেন। জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধু-বান্ধব ও সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশে বাতি জ্বালাবার জন্য যে ছেলে সন্তান ছিল, সেও মারা গেছে। আবার তিনি এমন দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার ফলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া মক্কা তো দূরের কথা সারা আরব দেশের কোন একটি লোকও তাঁর কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই তাঁর ভাগ্যের লিখন হচ্ছে জীবিত অবস্থায় ব্যর্থতা এবং মারা যাবার পরে দুনিয়ায় তাঁর নাম উচ্চারণ করার মতো একজন লোকও থাকবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বলা হলো, তোমাকে কাওসার দান করেছি তখন স্বাভাবিকভাবে এর মানে দাঁড়ালো ঃ তোমার শত্রুপক্ষীয় নির্বোধরা মনে করছে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো এবং নবুওয়াত লাভের পূর্বে তুমি যে নিয়ামত অর্জন করেছিলে তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে সীমাহীন কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নজিরবিহীন উন্নত নৈতিক গুণাবলী দান করা হয়েছিল সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। তাঁকে যে নবুওয়াত, কুরআন এবং জ্ঞান ও তা প্রয়োগ

www.icsbook.info

করার মতো বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামত দান করা হয়েছিল তাও এর মধ্যে শামিল। তাওহীদ ও এমন ধরনের একটি জীবন ব্যবস্থার নিয়ামত এর অন্তরভুক্ত যার সহজ, সরল, সহজবোধ্য, বুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মূলনীতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এবং হামেশা ছড়িয়ে পড়তে থাকার ক্ষমতা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা ব্যাপকতর করার নিয়ামতও এর অন্তরভুক্ত যার বদৌলতে তাঁর নাম চৌদ্দশো বছর থেকে দুনিয়ার সর্বত্র বুলন্দ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ হতে থাকবে। তাঁর আহবানে অবশেষে এমন একটি বিশ্বব্যাপী উম্মাতের উদ্ভব হয়েছে, যারা দুনিয়ায় চিরকালের জন্যে আল্লাহর সত্য দীনের ধারক হয়েছে, যাদের চাইতে বেশী সৎ, নিষ্কলুষ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়ার কোন উম্মাতের মধ্যে কখনো জন্ম লাভ করেনি এবং বিকৃতির অবস্থায় পৌঁছেও যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার সব জাতির চাইতেও বেশী কল্যাণ ও নেকীর গুণাবলী বহন করে চলছে। এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের চোখে নিজের জীবদ্দশায় নিজের দাওয়াতকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে দেখেছেন এবং তাঁর হাতে এমন জামায়াত তৈরি হয়েছে যারা সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতো, এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত। ছেলে সন্তান থেকে বঞ্চিত হবার পর শত্রুরা মনে করতো তাঁর নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে মিটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শুধু মুসলমানদের আকারে তাঁকে এমন ধরনের আধ্যাত্মিক সন্তান দিয়েই ক্ষান্ত হননি যারা কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম বুলন্দ করতে থাকবে বরং তাঁকে শুধুমাত্র একটি কন্যা হযরত ফতেমার মাধ্যমে এত বিপুল পরিমাণ রক্তমাংসের সন্তান দান করেছেন যারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহান নবীর সাথে সম্পর্কই যাদের সবচেয়ে বড় অহংকার। এটিও এ নিয়ামতের অন্তরভুক্ত।

নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মরজগতেই দান করেছেন। কত বিপুল পরিমাণে দান করেছেন তা লোকেরা দেখেছে। এগুলো ছাড়াও কাউসার বলতে আরো দু'টো মহান ও বিশাল নিয়ামত বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁকে আখেরাতে দান করবেন। সেগুলো সম্পর্কে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কাউসার বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে "হাউজে কাউসার" এটি কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে দান করা হবে। আর দ্বিতীয়টি "কাউসার ঝরণাধারা।" এটি জান্নাতে তাঁকে দান করা হবে। এ দু'টির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন যার ফলে এগুলোর নির্ভুল হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

হাউজে কাউসার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ তথ্য পরিবেশন করেছেন ঃ

এক ঃ এ হাউজটি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে। এমন এক কঠিন সময়ে এটি তাঁকে দেয়া হবে যখন সবাই 'আল আতশ' 'আল আতশ' অর্থাৎ পিপাসা, পিপাসা বলে চিৎকার করতে থাকবে সে সময় তাঁর উম্মাত তাঁর কাছে এ হাউজের চারদিকে সমবেত হবে এবং এর পানি পান করবে। তিনি সবার আগে সেখানে পৌঁছবেন এবং তার মাঝ বরাবর জায়গায় বসে থাকবেন। তাঁর উক্তি ঃ هو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة

www.icsbook.info

"সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাত এবং আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) انا فرطكم على الحوض "আমি তোমাদের সবার আগে সেখানে পৌঁছে যাবো।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল ও কিতাবুত তাহারাত, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক ও কিতাবুয যুহদ এবং মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىَ الْاٰنَ

"আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ দেবো এবং আল্লাহর কসম, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক)।

আনসারদেরকে সম্বোধন করে একবার তিনি বলেন ঃ

اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ

"আমার পরে তোমরা স্বার্থবাদিতা ও স্বজনপ্রীতির পাল্লায় পড়বে। তখন তার ওপর সবর করবে, আমার সাথে হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।" (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার ও কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ এবং তিরমিযী কিতাবুল ফিতান।

انا يوم القيمة عند عقر الحوض "কিয়ামতের দিন আমি হাউজের মাঝ বরাবর থাকবো।" (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) হযরত আবু বারযাহ আসলামীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হাউজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, "একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, বারবার শুনেছি। যে ব্যক্তি একে মিথ্যা বলবে আল্লাহ তাকে যেন তার পানি পান না করান।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ)। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হাউজ সম্পর্কিত রেওয়ায়াত মিথ্যা মনে করতো। এমন কি সে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা), বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও আয়েদ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো অস্বীকার করলো। শেষে আবু সাবরাহ একটি লিপি বের করে আনলেন। এ লিপিটি তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে শুনে লিখে রেখেছিলেন। তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের এ বাণী লেখা ছিল ঃ الا ان موعدكم حوضى "জেনে রাখো, আমার ও তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে আমার হাউজ।" (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়াতসমূহ)।

দুই ঃ এ হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছেঃ এটি আইলা (ইসরাঈলের বর্তমান বন্দর আইলাত) থেকে ইয়ামনের সান'আ পর্যন্ত অথবা আইলা থেকে এডেন পর্যন্ত কিংবা আম্মান থেকে এডেন পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর এটি চওড়া হবে আইলা থেকে হুজকাহ (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে একটি স্থান) পর্যন্ত জায়গার সমপরিমাণ। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, আবু দাউদ

www.icsbook.info

তায়ালাসী ৯৯৫ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, তিরমিযি—আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ এবং ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহদ।)। এ থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান লোহিত সাগরটিকেই কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। তবে আসল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে।

তিন ঃ এ হাউজটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝরণাধারা (সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) থেকে পানি এনে এতে ঢালা হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يشخب فيه ميزابان من الجنة এবং অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يعت فيه ميزابان يمدانه من الجنة অর্থাৎ জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে। (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يفتح نهر من الكوثر الى الحوض অর্থাৎ জান্নাতের কাওসার ঝরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

চার ঃ হাউজে কাউসারের অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার পানি হবে দুধের চাইতে (কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রূপার চাইতে আবার কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বরফের চাইতে) বেশী সাদা, বরফের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। তার তলদেশের মাটি হবে মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। আকাশে যত তারা আছে ততটি সোরাহী তার পাশে রাখা থাকবে। তার পানি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বার কারো পিপাসা লাগবে না। আর তার পানি যে একবার পান করেনি তার পিপাসা কোনদিন মিটবে না। সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ একথাগুলোই অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। (বুখারী–কিতাবুর রিকাক, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ–ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ, তিরমিযী–আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহোদ এবং আবু দাউদ আত তায়ালাসী, ৯৯৫ ও ২১৩৫ হাদীস।

পাঁচ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর সময়ের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার তরিকা পদ্ধতি পরিবর্তন করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং এর পানির কাছে তাদের আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার লোক। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে। তখন আমিও তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বলবো, দূর হয়ে যাও। এ বক্তব্যটিও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল ফিতান ও কিতাবুর রিকাক, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ—ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসসমূহ, ইবনে মাজাহ—কিতাবুল মানাসিক।) ইবনে মাজাহ এ ব্যাপারে যে

www.icsbook.info

হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দগুলো বড়ই হৃদয়স্পর্শী। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَسْوَدُّوْا وَجْهِىْ اَلاَ وَاِنِّى مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ اُنَاسٌ مِنِّىْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ –

"সাবধান হয়ে যাও। আমি তোমাদের আগে হাউজে উপস্থিত থাকবো। তোমাদের মাধ্যমে অন্য উম্মাতদের মোকাবিলায় আমি নিজের উম্মাতের বিপুল সংখ্যার জন্য গর্ব করতে থাকবো। সে সময় আমার মুখে কালিমা লেপন করো না। সাবধান হয়ে যাও! কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে নেবো আর কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী অভিনব কাজ কারবার করেছে।" ইবনে মাজার বক্তব্য হচ্ছে, এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরাফাত ময়দানের ভাষণে বলেছিলেন।

ছয় ঃ এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে এবং তার মধ্যে রদবদল করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলবো ঃ হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মাতের লোক। জবাবে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি কি পরিবর্তন করেছিল এবং আপনার পথের উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে দূর করে দেবো। এবং তাদেরকে হাউজের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবো না। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অসংখ্য হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল মুসাকাত, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, ইবনে মাজাহ—কিতাবুয যুহুদ, মুসনাদে আহমাদ–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ)।

পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী এ হাউজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগের আলেমগণ সাধারণভাবে এটিকে হাউজে কাউসার বলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুর রিকাকের শেষ অনুচ্ছেদের শিরোনাম রাখেন নিম্নোক্তভাবে ঃ بَابٌ فِى الْحَوْضِ وَقَوْلُ اللّٰهِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (হাউজ অনুচ্ছেদ, আর আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি)। অন্য দিকে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউসার সম্পর্কে বলেছেন ঃ هو حوض ترد عليه امتى "সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত সেখানে উপস্থিত হবে।"

জান্নাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার নামে যে নহরটি দেয়া হবে সেটির উল্লেখও অসংখ্য হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) থেকে এ সংক্রান্ত

www.icsbook.info

বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে তিনি বলেন (আবার কোন কোনটিতে তিনি স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করেন) ঃ মি'রাজে রসূলুল্লাহকে (সা) জান্নাতে সফর করানো হয়। এ সময় তিনি একটি নহর দেখেন। এ নহরের তীরদেশে ভিতর থেকে হীরা বা মুক্তার কারুকার্য করা গোলাকৃতির মেহরাবসমূহ ছিল। তার তলদেশের মাটি ছিল খাঁটি মিশকের সুগন্ধিযুক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) জিব্রীলকে বা যে ফেরেশতা তাঁকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ফেরেশতা জবাব দেন, এটা কাউসার নহর। আল্লাহ আপনাকে এ নহরটি দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ তায়ালাসী ও ইবনে জারীর। হযরত আনাস এক রেওয়ায়াতে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, অথবা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ কাউসার কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের। এর পানি দুধের চাইতেও সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)। মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) নহরে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার তলদেশে কাঁকরের পরিবর্তে মণিমুক্তা পড়ে আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের একটি নহর। এর তীরদেশ সোনার তৈরি এবং মণিমুক্তা ও হীরার ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। (অর্থাৎ তার তলায় কাঁকরের পরিবর্তে মূল্যবান পাথর বিছানো আছে)। এর মাটি মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। পানি দুধের চাইতে বেশী সাদা। বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ও মধুর চেয়ে বেশী মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, দারামী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবী শাইবা)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত হামযার (রা) বাড়িতে যান। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করেন। আলাপ আলোচনা করতে করতে এক সময় তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, আপনাকে জান্নাতে একটি নহর দেয়া হবে। তার নাম কাউসার। তিনি বলেন ঃ "হাঁ, তার যমীন ইয়াকুত, মারজান, যবরযদ ও মতির সমন্বয়ে গঠিত। (ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া। এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিপুল সংখ্যক হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে এর শক্তি বেড়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের অসংখ্য বক্তব্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলোতে কাউসার বলতে জান্নাতের এ নহরই বুঝানো হয়েছে। ওপরে এ নহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এ হাদীসগুলোতেও তাই বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আয়েশা (রা), মুজাহিদ ও আবুল আলীয়ার উক্তিসমূহ মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ঈদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে "ওয়ানহার" অর্থাৎ "নহর কর" শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের

www.icsbook.info

ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এই মনে হয় ঃ "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হুকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃন্দ নিজেদের মনগড়া মাবুদদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আল্লাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২-১৬৩)।

ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী, যাহহাক, রাবী' ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্‌সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা তাইয়েবায় আল্লাহর হুকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু ان صلاتى ونسكى আয়াতে এবং فصل لربك وانحر আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হুকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানেনুযুল নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের (সা) ইসতেমবাতও এক ধরনের ওহী।

৩. এখানে شانيك (শা-নিআকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে شنء (শানউন)। এর মানে এমন ধরনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যে কারণে একজন অন্য জনের বিরুদ্ধে অসদ্ব্যবহার করতে থাকে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

www.icsbook.info

"আর হে মুসলমানরা! কোন দলের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কোন বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ করতে সক্ষম না হও।"

কাজেই এখানে "শানিয়াকা" বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁর প্রতি দোষারোপ করে, তাঁকে গালিগালাজ করে, তাঁকে অবমাননা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপবাদ দিয়ে নিজের মনের ঝাল মেটায়।

৪. هو الابتر "সেই আবতার" বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে তোমাকে আবতার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই আবতার। আমি ইতিপূর্বে এ সূরার ভূমিকায় "আবতার" শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই শব্দের মূলে রয়েছে বাতারা (بتر) এর মানে কাটা। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাদীসে নামাযের যে রাকাতের সাথে অন্য কোন রাকাত পড়া হয় না তাকে বুতাইরা (بتيراء) বলা হয়। অর্থাৎ একক রাকাত। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يَبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

"যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রসংশাবাণী উচ্চারণ না করে শুরু করাটা আবতার।"

অর্থাৎ তার শিকড় কাটা গেছে। সে কোন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও আবতার বলে। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকে না এবং মারা যাবার পর তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় সমস্ত অর্থেই কুরাইশ কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার বলতো। তার জবাবে আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি আবতার নও বরং তোমার এ শত্রুই আবতার। এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না। বরং এটা ছিল আসলে কুরআনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর মধ্য থেকে একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারতো না যে, কুরাইশদের এ বড় বড় সরদাররা আবার কেমন করে আবতার হয়ে যাবে? তারা কেবল মক্কায়ই নয় সমগ্র দেশে খ্যাতিমান ছিল। তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল না বরং সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও হজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ সনে আহযাব যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদি গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিক পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হলো। কিন্তু এর মাত্র তিন বছর পরে ৮ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা আক্রমণ করলেন

www.icsbook.info

তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে হলো। এরপর এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করতলগত। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর হাতে বাই'আত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্য-সহায়হীন হয়ে পড়েছিল। তারপর তাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে মুছে গোলো যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শত্রুদের সন্তান। আর কেউ জানলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। বিপরীত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পড়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ব করে। লাখো লাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার-পরিজন এমন কি তাঁর সাথীদের পরিবার পরিজনের সাথেও সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে। এখানে কেউ সাইয়েদ, কেউ উলুবী, কেউ আব্বাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ উসমানী, কেউ যুবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতার নন বরং তাঁর শত্রুরাই আবতার।

---

www.icsbook.info

আল কাফিরুন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ আয়াতের "আল কাফিরুন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক যুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহকে (সা) কোন না কোন প্রকারে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এ জন্য তারা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরমূলা নিয়ে হাযির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত বেশী পরিমাণ ধন–সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, থামো! আমি দেখি

www.icsbook.info

আমার রবের পক্ষ থেকে কি হুকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় : قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ..... এবং এই সংগে নাযিল হয় : قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ

"ওদের বলে দাও, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো?" ইবনে আব্বাসের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : "হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে চুম্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।" একথায় এই সূরাটি নাযিল হয়। (আবদ ইবনে হুমাইদ)

আবুল বখতরীর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে : "হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা তোমার মাবুদদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চাইতে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।" একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফেরুন সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এই বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন। (আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।)

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবটিকে কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করেছিলেন। এবং (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যায়ের ছিল যেমন কোন অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোন অবাস্তব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, আমি আপনাদের আবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যা কিছু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অস্বীকার করলে লোকেরা বরাবর পীড়াপীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, ওপর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিরোধী তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে।

www.icsbook.info

নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন চুক্তি ও আপোশ করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপদেশ দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তরভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোন প্রকার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার আপোস বা উদারনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাযিলের সময় কাফের ও মুশরিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি বহুবার রসূলুল্লাহকে (সা) ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়তে দেখিছি। (এই বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি ঘুমুবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও। আর রসূল (সা) নিজেও যখন বিছানায় ঘুমুবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি। (বায়হাকী, তাবারানি ও ইবনে মারদুইয়া)।

www.icsbook.info

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও (আবুল ইয়ালা ও তাবারানি)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে বলেন, ঘুমুবার সময় قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে— (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা (রা) এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন— (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)।

www.icsbook.info

আয়াত ৬ **সূরা আল কাফিরুন-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

বলে দাও, হে কাফেররা![১] আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।[২] আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।[৩] আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।[৪] তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।[৫]

১. এ আয়াতে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো ঃ

(ক) যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তুমি কাফেরদের পরিষ্কার বলে দাও। তবুও সামনের আলোচনা জানিয়ে দিচ্ছে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক মু'মিনের সে কথাগুলোই কাফেরদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এমনকি যে ব্যক্তি কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে তার জন্যও কুফরী ধর্ম, তার পূজা-উপাসনা ও উপাস্যদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই 'কুল' (বলে দাও) শব্দটির মাধ্যমে প্রধানত ও প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ হুকুমটি বিশেষভাবে শুধু তাঁকেই করা হয়নি বরং তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিনকে করা হয়েছে।

(খ) এ আয়াতে প্রতিপক্ষকে যে "কাফের" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের জন্য কোন গালি নয়। বরং আরবী ভাষায় কাফের মানে অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী (Unbeliever)। এর মোকাবিলায় 'মু'মিন' শব্দটি বলা হয়, মেনে নেয়া ও স্বীকার করে নেয়া অর্থে (Beliver)। কাজেই আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হে কাফেররা!) বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, "হে লোকেরা! তোমরা যারা আমার রিসালাত ও আমার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করছো।" অনুরূপভাবে একজন মু'মিন যখন একথা বলবে অর্থাৎ যখন সে বলবে, "হে কাফেররা!" তখন কাফের বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেনি।

www.icsbook.info

(গ) "হে কাফেররা!" বলা হয়েছে, "হে মুশরিকরা" বলা হয়নি। কাজেই এখানে কেবল মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য পেশ করা হয়নি বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে শিক্ষা ও হিদায়াত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত বলে মেনে নেয় না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক বা সারা দুনিয়ার কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক যেই হোক না কেন, তাদের সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধনকে শুধুমাত্র কুরাইশ বা আরবের মুশরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই।

(ঘ) অস্বীকারকারীদেরকে 'হে কাফেররা' বলে সম্বোধন করা ঠিক তেমনি যেমন আমরা কিছু লোককে সম্বোধন করি "ওহে শত্রুরা" বা "ওহে বিরোধীরা" বলে। এ ধরনের সম্বোধনের ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী ব্যক্তিরা লক্ষ্য হয় না, লক্ষ হয় তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা। আর এ সম্বোধন ততক্ষণের জন্য হয় যতক্ষণ তাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকে। যখন তাদের কেউ এ শত্রুতা ও বিরোধিতা পরিহার করে অথবা বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যায় তখন সে আর এ সম্বোধনের লক্ষ থাকে না। অনুরূপভাবে যাদেরকে "হে কাফেররা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও তাদের কুফরীর কারণে এ সম্বোধনের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যক্তি সত্তার কারণে নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমৃত্যু কাফের থাকে তার জন্য এ সম্বোধন হবে চিরন্তন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার প্রতি আর এ সম্বোধন আরোপিত হবে না।

(ঙ) অনেক মুফাস্‌সিরের মতে এ সূরায় "হে কাফেররা" সম্বোধন কেবলমাত্র কুরাইশদের এমন কিছু লোককে করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীনের ব্যাপারে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা) বলে দিয়েছিলেন, এরা ঈমান আনবে না। দু'টি কারণে তারা এ মত অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, সামনের দিকে বলা হয়েছে لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (যার বা যাদের ইবাদাত তোমরা করো আমি তার বা তাদের ইবাদাত করি না)। তাদের মতে এ উক্তি ইহুদি ও খৃষ্টানদের জন্য সঠিক নয়। কেননা তারা আল্লাহর ইবাদাত করে। দ্বিতীয়ত, সামনের দিকে একথাও বলা হয়েছে ঃ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করছি)। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ সূরা নাযিলের সময় যারা কাফের ছিল এবং পরে ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে এ উক্তি সত্য নয়। কিন্তু এ উভয় যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। অবশ্যি এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি পরে করবো। তা থেকে জানা যাবে, এগুলোর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। তবে এখানে এ যুক্তির গলদ স্পষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি, যদি শুধুমাত্র উল্লেখিত লোকদেরকেই এ সূরায় সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সূরার তেলাওয়াত জারী থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে কুরআনে এটি লিখিত থাকারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

২. সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করে, ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, জীবিত ও মৃত মানুষের আত্মা তথা ভূত-প্রেত, চাঁদ, সূর্য, তারা, জীব-জন্তু, গাছপালা, মাটির মূর্তি বা কাল্পনিক দেব-দেবী সবই এর

www.icsbook.info

অন্তরভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে; আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহকেও তো মাবুদ ও উপাস্য বলে মানতো এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও আল্লাহর উপাস্য হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি। আর আহলি কিতাবরা তো আল্লাহকেই আসল মাবুদ বলে মানতো। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রমের উল্লেখ না করেই এদের সমস্ত মাবুদের ইবাদাত করা থেকে সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করা, যেখানে আল্লাহও তার অন্তরভুক্ত, কিভাবে সঠিক হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহকে অন্য মাবুদদের সাথে মিশিয়ে মাবুদ সমষ্টির একজন হিসেবে যদি অন্যদের সাথে তাঁর ইবাদাত করা হয় তাহলে তাওহীদ বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যি নিজেকে এ ইবাদাত থেকে দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করবে। কারণ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ মাবুদ সমষ্টির একজন মাবুদ নন। বরং তিনি একাই এবং একক মাবুদ। আর এ সমষ্টির ইবাদাত আসলে আল্লাহর ইবাদাত নয়। যদিও আল্লাহর ইবাদাত এর অন্তরভুক্ত। কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে একমাত্র সেটিই আল্লাহর ইবাদাত যার মধ্যে অন্যের ইবাদাতের কোন গন্ধও নেই এবং যার মধ্যে মানুষ নিজের বন্দেগীকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে।

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ (البينة : ٥)

"লোকদেরকে এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা পুরোপুরি একমুখী হয়ে নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর ইবাদাত করবে।

কুরআনের বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসা ১৪৫ ও ১৪৬, আল আ'রাফ ২৯, আয যুমার ২, ৩, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং আল মু'মিন ১৪ ও ৬৪–৬৬ আয়াতসমূহ। এ বক্তব্য একটি হাদীসে কুদসীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শরীকের অংশীদারিত্ব থেকে আমি সবচেয়ে বেশী মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করেছে যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, তা থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আমার সাথে যাকে সে ঐ কাজে শরীক করেছে, ঐ সম্পূর্ণ কাজটি তারই জন্য (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)। কাজেই আল্লাহকে দুই, তিন বা বহু ইলাহের একজন গণ্য করা এবং তাঁর সাথে অন্যদের বন্দেগী, উপাসনা ও পূজা করাই হচ্ছে আসল কুফরী এবং এ ধরনের কুফরীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করাই এ সূরার উদ্দেশ্য)

৩. এখানে মূলে مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় مَا (মা) শব্দটি সাধারণত নিষ্প্রাণ বা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বস্তু বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন জীবের জন্য مَنْ (মান) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ কারণে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে مَنْ اَعْبُدُ না বলে مَا اَعْبُدُ বলা হলো কেন? মুফাস্সিরগণ সাধারণত এর চারটি জবাব দিয়ে থাকেন। এক, এখানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, এখানে مَا শব্দটি اَلَّذِىْ (আললাযী) অর্থাৎ যে বা যাকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিন, উভয়, বাক্যেই مَا শব্দটি মূল শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এখানে এর অর্থ হয় ঃ আমি সেই ইবাদাত করি না যা তোমরা করো। অর্থাৎ মুশরিকী ইবাদাত। আর

www.icsbook.info

তোমরা সেই ইবাদাত করো না যা আমি করি অর্থাৎ তাওহীদবাদী ইবাদাত। চার, প্রথম বাক্যে যেহেতু مَا تَعْبُدُوْنَ বলা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বাক্যে বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একই শব্দ বলা হয়েছে কিন্তু এর মানে এক নয়। কুরআন মজীদে এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

"যে ব্যক্তি তোমার ওপর বাড়াবাড়ি করে তুমিও তার ওপর তেমনি বাড়াবাড়ি করো যেমন সে তোমার ওপর করেছে।"

একথা সুস্পষ্ট যে, কারো বাড়াবাড়ির জবাবে ঠিক তেমনি বাড়াবাড়িমূলক আচরণকে আসলে বাড়াবাড়ি বলে না। কিন্তু নিছক বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই জবাবী কার্যকলাপকে বাড়াবাড়ি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা তাওবার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ "তারা আল্লাহকে ভুলে গেলো কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেলেন।" অথচ আল্লাহ ভোলেন না। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়ার জবাবে আল্লাহ ভুলে যাওয়া শব্দটি নিছক বক্তব্যের মধ্যে মিল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এ চারটি অর্থ যদিও এক এক দৃষ্টিতে যথার্থ এবং আরবী ভাষায় এসব অর্থ গ্রহণ করার অবকাশও রয়েছে তবুও যে মূল বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য مَنْ اَعْبُدُ এর জায়গায় مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে তা এর মধ্য থেকে কোন একটি অর্থের মাধ্যমেও পাওয়া যায় না। আসলে আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির জন্য مَنْ শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং مَا শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার গুণগত সত্তা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আমাদের ভাষায় কারো সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তখন তার ব্যক্তি সত্তার পরিচিতি লাভ করাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি, ইনি কি? তখন আসলে আমরা চাই তার গুণগত পরিচিতি। যেমন তিনি যদি সেনাবাহিনীর লোক হন তাহলে সেখানে তার পদমর্যাদা কি? তিনি যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাহলে সেখানে তিনি রীডার, লেকচারার না প্রফেসর কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তিনি কোন্ বিষয়টি পড়ান? তার ডিগ্রী কি ইত্যাদি বিষয় জানাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যদি এ আয়াতে বলা হতো لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَنْ اَعْبُدُ তাহলে এর অর্থ হতো, তোমরা সেই সত্তার ইবাদাত করবে না যার ইবাদাত আমি করছি। এর জবাবে মুশরিক ও কাফেররা বলতে পারতো ঃ আল্লাহর সত্তাকে তো আমরা মানি এবং তার ইবাদাতও করি। কিন্তু যখন বলা হলো ঃ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ তখন অর্থ দাঁড়ালো ঃ যেসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত আমি করি সেইসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত তোমরা করবে না। এখানে মূল বক্তব্য এটিই। এরি ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন সব ধরনের কাফেরদের দীন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। কারণ সব ধরনের কাফেরদের খোদা থেকে তাঁর খোদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কারো খোদার ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সে বিশ্ব-জগতের প্রভু

www.icsbook.info

নয় বরং ইসরাঈলের প্রভু। একটি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে তার এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের সাথে নেই। সে হযরত ইয়াকুবের সাথে কুস্তি লড়ে কিন্তু তাকে আছাড় দিতে পারে না। তার উযাইর নামক একটি ছেলেও আছে। আবার কারো খোদা হযরত ঈসা মসিহ নামক একমাত্র পুত্রের পিতা। সে অন্যদের গুণাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য নিজের পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করায়। কারোর খোদার স্ত্রী-সন্তান আছে। কিন্তু সে বেচারার শুধু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার কারো খোদা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষের দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে এবং মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারো খোদা নিছক অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সকল কার্যকারণের কারণ কিংবা প্রথম কার্যকারণ (First Cause)। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনাকে একবার সচল করে দিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বিশ্ব-জাহান ধরাবাধা আইন মুতাবেক স্বয়ং চলছে। অতপর মানুষের সাথে তার ও তার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, খোদাকে মানে এমন সব কাফেরও আসলে ঐ আল্লাহ মানে না যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনার শুধু স্রষ্টাই নন বরং তার সার্বক্ষণিক পরিচালক। তাঁর হুকুম এখানে প্রতি মুহূর্তেই চলছে। তিনি সকল প্রকার দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তিনি সব রকমের উপমা ও সাকার সত্তা থেকে পবিত্র, নজীর, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য মুক্ত এবং কোন সাথী, সহকারী ও অংশীদারের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও মাবুদ হবার অধিকারে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তাঁর সন্তানাদি থাকা, কাউকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এবং কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিটি সত্তার সাথে রিজিকদাতা, পালনকর্তা, অনুগ্রহকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি এবং ভাগ্যের ভাঙা-গড়ার পূর্ণ ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের সৃষ্টির কেবল পালনকর্তাই নন বরং প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিদায়াতও দান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল এতটুকুই নয় যে, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর পূজা অর্চনাকারী বরং তিনি নিজের নবী ও কিতাবের সাহায্যে আমাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করেন এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার আমাদের ওঠাবেন এবং আমাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মাবুদের ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ করছে না। অন্যেরা খোদার ইবাদাত করলেও আসল ও প্রকৃত খোদার ইবাদাত করছে না। বরং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত কাল্পনিক খোদার ইবাদাত করছে।

৪. একদল তাফসীরকারের মতে এ বাক্য দু'টিতে প্রথম বাক্য দু'টির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে অত্যধিক শক্তিশালী ও বেশী জোরদার করার জন্য এটা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্সির একে পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, এর মধ্যে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে একথার বক্তব্যই আলাদা। আমার মতে, এ বাক্য দু'টিতে আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এতটুকু কথা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়।

www.icsbook.info

কারণ এখানে শুধুমাত্র "আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি" একথাটুকুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর আগের বক্তব্যে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছিল এখানে সে অর্থে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করার পর মুফাস্‌সিরগণের এ দলটি এ দু'টি বাক্যের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা পরস্পর অনেক ভিন্নধর্মী। এখানে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করে তার ওপর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশংকায় শুধুমাত্র আমার মতে যে অর্থটি সঠিক সেটিই এখানে বর্ণনা করলাম।

প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।" এর বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আর আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" এ দু'টি বক্তব্যে দু'টি দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক, আমি অমুক কাজ করি না বা করবো না বলার মধ্যে যদিও অস্বীকৃতি ও শক্তিশালী অস্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু আমি উমুক কাজটি করবো না একথার ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, সেটা এত বেশী খারাপ কাজ যে, সেটা করা তো দূরের কথা সেটা করার ইচ্ছা পোষণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুই, "যাদের ইবাদাত তোমরা করো" একথা বলতে কাফেররা বর্তমানে যেসব মাবুদদের ইবাদাত করে শুধুমাত্র তাদেরকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষে "যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো" বললে এমনসব মাবুদদের কথা বুঝায় যাদের ইবাদাত কাফেররা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে করেছে। একথা সবাই জানে, মুশরিক ও কাফেরদের মাবুদদের মধ্যে হামেশা রদবদল ও কমবেশী হতে থেকেছে। বিভিন্ন যুগে কাফেরদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের পূজা করেছে। সবসময় ও সব জায়গায় সব কাফেরের মাবুদ কখনো এক থাকেনি। কাজেই এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের শুধু আজকের মাবুদদের থেকে নয়, তোমাদের পিতৃপুরুষদের মাবুদদের থেকেও দায়মুক্ত। এ ধরনের মাবুদদের ইবাদাত করার চিন্তাও মনের মধ্যে ঠাঁই দেয়া আমার কাজ নয়।

আর দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাপারে বলা যায়, যদিও ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত এ বাক্যটির শব্দাবলী ও ৩ নম্বর আয়াতের শব্দাবলী একই ধরনের তবুও এদের উভয়ের মধ্যে অর্থের বিভিন্নতা রয়েছে। তিন নম্বর আয়াত সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে ঃ "আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" তাই এর অর্থ হয়, "আর না তোমরা সেই ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন একক মাবুদের ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।" আর পাঁচ নম্বর আয়াতে এই সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছেঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো।" তাই এর মানে হয়, "আর না তোমরা সেই একক মাবুদের ইবাদাত করবে বলে মনে হচ্ছে যার ইবাদাত আমি করি।" অন্য কথায়, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের যাদের পূজা-উপাসনা করেছো তাদের পূজারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বহু মাবুদের বন্দেগী পরিহার করে একক মাবুদের ইবাদাত করার ব্যাপারে তোমাদের যে বিতৃষ্ণা সে কারণে তোমরা নিজেদের এ ভুল ইবাদাত-বন্দেগীর পথ ছেড়ে দিয়ে আমি যাঁর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত করার পথ অবলম্বন করবে, এ আশাও করি না।

www.icsbook.info

৫. অর্থাৎ আমার দীন আলাদা এবং তোমাদের দীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা-উপাসনা-বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা-উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমার পথ কখনো এক হতে পারে না। এটা কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না—এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে পর পর এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে তাহলে বলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত।" (৪১ আয়াত) এ সূরাতেই তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" (১০৪ আয়াত) সূরা আশ শু'আরায় বলেছেন ঃ "হে নবী! যদি এরা এখন তোমার কথা না মানে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। (২১৬ আয়াত) সূরা সাবায় বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, আমাদের ত্রুটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলো, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" (২৫-২৬ আয়াত) সূরা যুমার-এ বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" (৩৯-৪০ আয়াত) আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলমানকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি ভালো আদর্শ। (সেটি হচ্ছে ঃ) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" (আল মুমতাহিনা ৪ আয়াত) কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও—"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন"-এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা যুমার-এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আমি তো আমার দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।" (১৪ আয়াত)।

www.icsbook.info

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাফেরদের ধর্ম পরস্পর যতই বিভিন্ন হোক না কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাফেররা মূলত একই গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বংশ বা বিবাহের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে এমন কোন সম্পর্ক থাকে যা একের সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারী স্বত্ব দাবী করে তাহলে একজন খৃষ্টান একজন ইহুদীর, একজন ইহুদী একজন খৃষ্টানের এক ধর্মের কাফের অন্য ধর্মের কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لا يتوارث اهل ملتين شتى "দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, দারে কুতনী)। প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে, ইবনে হিব্বান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হুরাইরা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়টি আলোচনা প্রসংগে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম শামসুল আয়েম্মা সারাখসী লিখেছেন : যে সমস্ত কারণে মুসলমানরা পরস্পরের ওয়ারিশ হয় সে সমস্ত কারণে কাফেররাও পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে এমন কোন কোন অবস্থায়ও উত্তরাধিকার স্বত্ব জারী হতে পারে যে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হয় না।..... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে দু'টি একটি সত্য দীন এবং অন্যটি মিথ্যা দীন। তাই তিনি বলেছেনঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই সাথে তিনি মানুষদেরও দু'দলে বিভক্ত করেছেন। একদল জান্নাতী এবং তারা হচ্ছে মু'মিন। আর একদল জাহান্নমী এবং সামগ্রিকভাবে তারা হচ্ছে কাফের সমাজ। এ দু'দলকে তিনি পরস্পরের বিরোধী গণ্য করেছেন তাই তিনি বলেছেন : هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (এই দু'টি পরস্পর বিরোধী দল। এদের মধ্যে রয়েছে নিজেদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।—আল হজ্জ ১৯ আয়াত) অর্থাৎ সমস্ত কাফেররা মিলে একটি দল। তাদের বিরোধ ঈমানদার বা মু'মিনদের সাথে।..... তাদেরকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা মিল্লাতে তথা মানব গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত বলে আমরা মনে করি না। বরং মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই একটি মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে। অন্যদিকে তারা এসব অস্বীকার করে। এ জন্য তাদেরকে কাফের বলা হয়। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় لا يتوارث اهل ملتين হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে যে কথার উল্লেখ করেছি সেদিকেই ইংগিত করে। কারণ, "মিল্লাতাইন" (দুই মিল্লাত তথা দুই গোষ্ঠী) শব্দের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে করে দিয়েছেন : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ "মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফের হতে পারে না মুসলমানের ওয়ারিশ।" [আল মাবসূত ৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। ইমাম সারাখসী এখানে যে হাদীসটির বরাত দিয়েছেন সেটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।]

www.icsbook.info

আন নসর

১১০

নামকরণ

প্রথম আয়াত اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ -এর মধ্যে উল্লেখিত নসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। (তিরমিযী, বায়যাবী, বাইহাকী, ইবনে শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া)। বাইহাকী কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের প্রদত্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

---

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারাআ ইবনে আযেবের (রা) রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ ، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সূদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর (রা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আব্বাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ এটি সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতের অন্তরভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮–৩৯ রুকূ') কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ সূরা বাকারার এ ২৮১ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে ঃ এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ৮১ দিন আগে নাযিল হয়। অন্যদিকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়া ও রসূলের (সা) ওফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা তাওবার ১২৮–১২৯ আয়াত দু'টি সবশেষে নাযিল হয়।

www.icsbook.info

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা জানো আজ কোন দিন? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন জায়গা? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে মিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শোনো, একথাগুলো তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রসূলের (সা) ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হযরত উমর (রা) বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাঁদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে

www.icsbook.info

আমাকে শরীক করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সূরায় আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হযরত উমর (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস তুমিও কি একথাই বলো? আমি বললাম ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি কি বলো। আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সূরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হাম্‌দ ও ইস্তিগফার করুন। একথা শুনে হযরত উমর বললেন, তুমি যা বললে আমিও এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হযরত উমর বয়স্ক বদরী সাহাবীদের বললেন ঃ আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরস্কার করেন? (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনযির)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপ্লব করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবদ্দশাতেই যদি সেই মহান বিপ্লব সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এ জন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার

www.icsbook.info

এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হুকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের পূর্বে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ কোন কোন রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেমা। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় নিজের রুকূ' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের ব্যাখ্যা। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুনা যেতোঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ যিকিরটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত যিকিরটি বেশী করে করতে থাকেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ (ابن جرير ، مسند احمد – ابن ابى حاتم)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জোরেশোরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি। (নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

www.icsbook.info

আয়াত ৩ **সূরা আন নসর-মাদানী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,[১] আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে[২] তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো[৩] এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও।[৪] অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

১. বিজয় মানে কোন একটি যুদ্ধ বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে বিজয় মানে করেছেন মক্কা বিজয়। কিন্তু মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ হিজরীতে এবং এ সূরাটি নাযিল হয়েছে ১০ হিজরীর শেষের দিকে। ভূমিকায় আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে একথাই জানা যায়। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যে একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা বলেছেন, তাঁর এ বক্তব্যও এ তাফসীরের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ বিজয়ের মানে যদি মক্কা বিজয় হয় তাহলে সমগ্র সূরা তাওবা মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। তাহলে আন নসর কেমন করে শেষ সূরা হতে পারে? নিসন্দেহে মক্কা বিজয় এ দিক দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিল যে, তারপর আরবের মুশরিকদের সাহস ও হিম্মত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ ছিল। এরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধ। আরবে ইসলামের পূর্ণাংগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল।

২. অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে

www.icsbook.info

মুসলমান হয়ে যেতে থাকবে। নবম হিজরীর শুরু থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এ বছর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে। তারা ইসলাম কবুল করে তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি দশম হিজরীতে যখন তিনি বিদায় হজ্জ করার জন্য মক্কায় যান তখন সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সারাদেশে কোথাও একজন মুশরিক ছিল না।

৩. হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও। আর তাসবীহ মানে আল্লাহকে পাক–পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষ–ত্রুটিমুক্ত গণ্য করা। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, যখন তুমি তোমার রবের কুদরতের এ অভিব্যক্তি দেখবে তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে হামদ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সময় বিন্দুমাত্রও ধারণা না জন্মায় যে, এসব তোমার নিজের কৃতিত্বের ফল। বরং একে পুরোপুরি ও সরাসরি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মনে করবে। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে ও মুখে একথা স্বীকার করবে যে, এ সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আর তাসবীহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার বিষয়টি তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল ছিল—এ ধরনের ধারণা থেকে তাঁকে পাক ও মুক্ত গণ্য করবে। বিপরীত পক্ষে তোমার মন এ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে যে, তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর যে বান্দার থেকে চান কাজ নিতে পারতেন। তবে তিনি তোমার খিদমত নিয়েছেন এবং তোমার সাহায্যে তাঁর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ ছাড়া তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়ার মধ্যে বিস্ময়েরও একটি দিক রয়েছে। কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলে মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। এর অর্থ হয়, আল্লাহর অসীম কুদরতে এহেন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। নয়তো এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির ছিল না।

৪. অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল–ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দীনের যতবড় খিদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তার ওপর তার রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ–ত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খেদমত কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তার নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর যে অধিকার তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ

www.icsbook.info

অহংকারে মত্ত হওয়ার কোন সুযোগই কি তার থাকে? কোন সৃষ্টি আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই।

মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীনি খেমদতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে থাকবে।

---

www.icsbook.info

আল লাহাব

১১১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের লাহাব (لَهَبٍ) শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্কী যুগের কোন্ সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রসূলের (সা) সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতো। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরাতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুঝার জন্য সমকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

www.icsbook.info

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আরব দেশের সব জায়গায় অশান্তি, বিশৃংখলা, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোন ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন-প্রাণ ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আরবীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আরবের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও রসূলুল্লাহর (সা) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের এ সমর্থন-সহযোগিতাকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিক্কার দেয়নি যে, তোমরা একটি ভিন্ন ধর্মের আহবায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। তারা একথা জানতো এবং স্বীকারও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যকে তারা কোনক্রমেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আরবের লোকেরা এ নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন লোক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। রসূলের (সা) পিতা এবং এ আবু লাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আরবে চাচাকে বাপের মতই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হুকুম দেয়া হলো এবং কুরআন মজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো : "সবার আগে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন يا صباحاه (হায়, সকাল বেলার বিপদ!) আরবে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে ভোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোন শত্রুদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রসূলুল্লাহর (সা) এ আওয়াজ শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে আওয়াজ দিচ্ছে?

www.icsbook.info

বলা হলো মুহাম্মাদ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ দিচ্ছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারতো সে নিজে এসে গেলো এবং যে নিজে আসতে পারতো না সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌঁছে গেলে তিনি কুরাইশের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন ঃ হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের একথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যা কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে। একথায় অন্যকেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো ঃ تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছিলে?" অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর ইত্যাদি)।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবু লাহাব একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কি পাবো? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো ঃ আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই? জবাব দিলেন ঃ আপনি আর কি চান? একথায় সে বললো ঃ تَبًّا لِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً "সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হবে।" (ইবনে জারীর)

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এ ছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের বাপ), উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হুযালীও তাঁর প্রতিবেশী ছিল। এরা বাড়িতেও রসূলুল্লাহকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভুড়ি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আঙিনায় রান্নাবান্না হতো এরা হাঁড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রসূলুল্লাহ (সা) বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, "হে বনী আবদে মান্নাফ! এ কেমন প্রতিবেশীসুলভ আচরণ?" আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার সামনে কাঁটাগাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইরে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়। (বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম)।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তার দুই

www.icsbook.info

ছেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলে ঃ আমি وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এবং الَّذِىْ دَنَا فَتَدَلّٰى অস্বীকার করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর এর ওপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিংস্র জানোয়ারদের আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে, আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মাদের (সা) বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে সে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নুবুওয়া লি আবী নাঈম আল ইসফাহানী ও রওদুল উনুফ লিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" এর নাযিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উতবা ছিল না উতাইবা—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর উতবা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের এ তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

সে যে কেমন জঘন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে হযরত আবুল কাসেমের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে হযরত আবদুল্লাহরও ইন্তিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীক না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সে তাদেরকে জানায় ঃ শোনো, আজ মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম নিশানা মুছে গেছে। তার এ ধরনের আচরণের কথা আমরা ইতিপূর্বে সূরা কাউসারের ব্যাখায় উল্লেখ করে এসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাবও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবী'আহ ইবনে আব্বাদ আদদীলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আব্বার সাথে যুল-মাজাযের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, "এ ব্যক্তি মিথ্যুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে? লোকেরা

www.icsbook.info

বললো, ওঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী) এ একই বর্ণনাকারী হযরত রাবীআহ (রা) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে বনী অমুক! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল। তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।" তাঁর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল ঃ "হে বনী অমুক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে লাত ও উযযার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না এবং এর পেছনেও চলো না।" আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবীর (রা) রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, "হে লোকেরা! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।" ওদিকে তাঁর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, " এ মিথ্যুক, এর কথা শুনো না।" আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো ঃ ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (তিরমিযী)

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনি হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু'টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ হয়ে গেলো তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশের সহগামী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুখী। বাইর থেকে মক্কায় কোন বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিৎকার করে বণিকদেরকে বলতো ঃ ওদের কাছে এতো বেশী দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এ জন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো। ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ্ট বুকে পুষে রেখে খালি হাতে পাহাড়ে ফিরে যেতে হতো ক্ষুধা কাতর সন্তানদের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো। (ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশাম)

এই সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছিল যে, মক্কার বাইরের আরবের যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যারা জমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের

www.icsbook.info

চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোন চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে, তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কল্পনাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোন প্রকার সমঝোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোন কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই বা অমুকের বাপের কোন গুরুত্ব নেই।

www.icsbook.info

আয়াত ৫ **সূরা আল লাহাব-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

ভেঙে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে।[১] তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি।[২] অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও,[৩] লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ,[৪] তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।[৫]

১. আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয্যা। তাকে আবু লাহাব বলে ডাকার কারণ, তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা লালে মেশানো। লাহাব বলা হয় আগুনের শিখাকে। কাজেই আবু লাহাবের মানে হচ্ছে আগুন বরণ মুখ। এখানে তার আসল নামের পরিবর্তে ডাক নামে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, মূল নামের পরিবর্তে ডাকনামেই সে বেশী পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ, তার আবদুল উয্যা (অর্থাৎ উয্যার দাস) নামটি ছিল একটি মুশরিকী নাম। কুরআনে তাকে এ নামে উল্লেখ করা পছন্দ করা হয়নি। তৃতীয় কারণ, এ সূরায় তার যে পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার এ ডাকনামই বেশী সম্পর্কিত।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ -এর অর্থ কোন কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত" এবং وَتَبَّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক" অথবা "সে ধ্বংস হয়ে গেছে।" কিন্তু আসলে এটা তার প্রতি কোন ধিক্কার নয়। বরং এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর আসলে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল। হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়া নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে

www.icsbook.info

তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। আর আবু লাহাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে এত বেশী মর্মাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। তারপর তার মৃত্যুও ছিল বড়ই ভয়াবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তার শরীরে সাংঘাতিক ধরনের ফুসকুড়ি (Malignant Pustule) দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরার পরও তিন দিন পর্যন্ত তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁসেনি। ফলে তার লাশে পচন ধরে। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শেষে লোকেরা তার ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। একটি বর্ণনা অনুসারে তখন তারা মজুরীর বিনিময়ে তার লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করে এবং তারা তার লাশ দাফন করে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, তারা গর্ত খুঁড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে তার লাশ তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং ওপর থেকে তার ওপর মাটি চাপা দেয়। যে দীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরাত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব হযরত আব্বাসের (রা) মধ্যস্থতায় রসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করেন।

২. আবু লাহাব ছিল হাড়কৃপণ ও অর্থলোলুপ। ইবনে আসীরের বর্ণনা মতে, জাহেলী যুগে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে কা'বা শরীফের কোষাগার থেকে দু'টি সোনার হরিণ চুরি করে নিয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই হরিণ দু'টি অন্য একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তবুও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনার ফলে তার সম্পর্কে মক্কার লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। তার ধনাঢ্যতা সম্পর্কে কাজী রশীদ ইবনে যুবাইর তাঁর "আযযাখায়ের ওয়াত'তুহাফ" (الذَّخَائِرَ والتُّحَف) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কুরাইশদের মধ্যে যে চারজন লোক এক কিনতার (এক কিনতার= দুশো আওকিয়া আর এক আওকিয়া = সোয়া তিন তোলা কাজেই এক কিনতার সমান ৮০ তোলার সেরের ওজনে ৮ সের ১০ তোলা) সোনার মালিক ছিল আবু লাহাব তাদের একজন। তার অর্থ লোলুপতা কি পরিমাণ ছিল বদর যুদ্ধের সময়ের ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ যুদ্ধে তার ধর্মের ভাগ্যের ফায়সালা হতে যাচ্ছিল। কুরাইশদের সব সরদার এ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু আবু লাহাব নিজে না গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। তাকে বলে দেয়, তার কাছে সে যে চার হাজার দিরহাম পায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর বদলে তার সেই ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। এভাবে সে নিজের ঋণ আদায় করার একটা কৌশল বের করে নেয়। কারণ আস দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঋণ পরিশোধের কোন ক্ষমতাই তার ছিল না।

www.icsbook.info

কোন কোন তাফসীরকার مَا كَسَبَ শব্দটিকে উপার্জন অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের অর্থ থেকে সে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তার উপার্জন। আবার অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন সন্তান-সন্ততি। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তানরা মানুষের উপার্জন (আবু দাউদ ও ইবনে আবী হাতেম)। এ দু'টি অর্থই আবু লাহাবের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। কারণ সে মারাত্মক ফুসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হলে তার সম্পদ তার কোন কাজে লাগেনি এবং তার সন্তানরাও তাকে অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেরা তার লাশটি মর্যাদা সহকারে কাঁধে উঠাতেও চাইল না। এভাবে এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল লোকেরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সত্য হতে দেখলো।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল "আরদা"। "উম্মে জামীল" ছিল তার ডাক নাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে সে তার স্বামী আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। হযরত আবু বকরের (রা) মেয়ে হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর উম্মে জামীল যখন এটি শুনলো, সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের হলো। তার হাতের মুঠোয় পাথর ভরা ছিল রসূলুল্লাহকে (সা) গালাগালি করতে করতে নিজের রচিত কিছু কবিতা পড়ে চলছিল। এ অবস্থায় সে কা'বা ঘরে পৌঁছে গেলো। সেখানে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বসেছিলেন। হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন সে আসছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আপনাকে দেখে কিছু অভদ্র আচরণ করবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবে হলোও তাই। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেলো না। সে আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, শুনলাম তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ এ ঘরের রবের কসম, তিনি তো তোমার কোন নিন্দা করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেলো—(ইবনে আবী হাতেম, সীরাতে ইবনে হিশাম। বায্যারও প্রায় একই ধরনের একটি রেযয়ায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন)। হযরত আবু বকরের (রা) এ জবাবের অর্থ ছিল, নিন্দা তো আল্লাহ করেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি।

৪. মূল শব্দ হচ্ছে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কাঠ বহনকারিনী।" মুফাস্সিরগণ এর বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে যায়েদ, যাহহাক ও রাবী ইবনে আনাস বলেন ঃ সে রাতের বেলা কাঁটা গাছের ডালপালা এনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকরিনী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকরামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ সে লোকদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চোগলখুরী করে বেড়াতো। তাই আরবী প্রবাদ অনুযায়ী তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। কারণ যারা এর কথা ওর কাছে বলে এবং লাগানো ভাঙানোর কাজ করে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে আরবরা তাদেরকে কাঠ বহনকারিনী বলে থাকে। এ প্রবাদ অনুযায়ী "হাম্মালাতাল হাতাব" শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "যে লাগানো ভাঙানোর কাজ করে।" সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করে আরবী

www.icsbook.info

প্রবাদ অনুসারে তার সম্পর্কে বলা হয়, فُلَانٌ يُحْطَبُ عَلٰى ظَهْرِهٖ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাঠ বহন করছে)। কাজেই হাম্মালাতাল হাতাব (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) মানে হচ্ছে, "গোনাহের বোঝা বহনকারিনী।" মুফাস্‌সিরগণ এর আরো একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, আখেরাতে তার এ অবস্থা হবে। অর্থাৎ সেখানে যে আগুনে আবু লাহাব পুড়তে থাকবে তাতে সে (উম্মে জামীল) কাঠ বহন করে এনে ফেলতে থাকবে।

৫. তার গলার জন্য জীদ (جِيْد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তাকে জীদ বলা হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উয্‌যার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। এ কারণে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। এটা ঠিক সমপর্যায়েরই ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য যেমন কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"

তার গলায় বাঁধা রশিটির জন্য حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে রশিটি হবে 'মাসাদ" ধরনের। অভিধানবিদ ও মুফাস্‌সিরগণ এ শব্দটির বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে মাসাদ বলা হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল থেকে তৈরি রশি মাসাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে, এর মানে খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি।

---

www.icsbook.info

আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শুধু এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। (তাবারানী)।

(২) আবুল আলীয়াহ হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিযী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বরাত নেই। ইমাম তিরমিযী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, اِنْسِبْ لَنَا (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বংশধারার। সে কোন্ বংশের লোক? কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, اِنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান।

www.icsbook.info

(৩) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া)।

(৪) ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, "হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে রব আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।" এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত)

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তাঁর সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(৫) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, খয়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, "হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পচাগলা মাটির পিণ্ড থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোঁয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সম্বন্ধে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্ট?)" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোন জবাব দেননি। তারপর জিব্রীল (আ) আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "হুওয়াল্লাহু আহাদ" (তিনি আল্লাহ এক ও একক).....

(৬) আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহকে (সা) বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের কোন জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর দিকে।" আমের বলে ঃ "তালো, তাহলে তার অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সোনার তৈরি, না রূপার অথবা লোহার?" একথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

(৭) যাহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। তারা বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রভুক্ত? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, রূপা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর মালিকানা লাভ করেছেন? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

(৮) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খৃষ্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে ঃ "আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন? তিনি কিসের তৈরি?"

www.icsbook.info

তিনি বলেন, "আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।" এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমস্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মাবুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হুকুমে লোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মক্কায় কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইয়েবায় কখনো ইহুদী, কখনো খৃষ্টান আবার কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরাও রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোন আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবার উত্থাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে লোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বারবার নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোন বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো ঃ তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত–বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মক্কায় হযরত বেলালকে (রা) তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিতো তখন তিনি "আহাদ" "আহাদ" বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা–ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি খোদার কাল্পনিক মূর্তিসমূহের পূজা করতো। সেই মূর্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও

www.icsbook.info

দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বংশধারাও ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতার হয়ে থাকে। খৃষ্টানরা এক খোদায় বিশ্বাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের খোদার কমপক্ষে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রুহুল কুদুসও (জিব্রীল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা-ও ছিল এবং শাশুড়ীও। ইহুদিরাও এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও বস্তুসত্তা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ খোদা টহল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোন বান্দার সাথে কুশ্তিও লড়তো। তার একটি পুত্রও (উযাইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশভংগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ গুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান—এ মর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাস'উদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালাত। তিন, আখেরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ (সা) একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রত্যেক নামাযে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে কিরআত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহর (সা) কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে লোকদের বলেন ঃ اخبروه ان الله تعالى يحبه "তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।"

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী কুবার মসজিদে নামায পড়াতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ কেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র "কুল হুওয়াল্লাহ" পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহর (সা) সামনে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন্ জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন ঃ এ সূরাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ حبك اياها ادخلك الجنة অর্থাৎ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

www.icsbook.info

আয়াত ৪ | সূরা আল ইখলাস-মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

বলো,[১] তিনি আল্লাহ,[২] একক।[৩] আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।[৪] তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।[৫] এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[৬]

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাঁকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রসূলের (সা) তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহকে (সা) যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আসিনি। অন্যসব মাবুদদের ইবাদাত ত্যাগ করে কোন নতুন মাবুদের ইবাদাত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে সত্তার সাথে তোমরা পরিচিত তিনি সেই সত্তা। আরবদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য দেবতার সাথে এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তারা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময়। সে সময় কা'বাঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মূর্তি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কা'বাঘরকেও তারা এসব ইলাহের সাথে সম্পর্কিত করে বায়তুল আ-লিহাহ (ইলাহ-এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে একে বলতো বায়তুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের আকীদা কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা

www.icsbook.info

যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরে পয়দা করেছে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৮৭ আয়াত)

সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশসমূহ ও যমীনকে কে পয়দা করেছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বলবে আল্লাহ।.....আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সঞ্জীবতা দান করলেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৬১–৬৩ আয়াত)।

সূরা মু'মিনূনে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জনবসতি কার? এরা অবশ্যি বলবে আল্লাহর।.....এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাআরশের মালিক কে? এরা অবশ্যি বলবে, আল্লাহ।..... এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর কার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত? আর কে আশ্রয় দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারেন না? এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ ব্যাপারটি তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (৮৪–৮৯ আয়াত)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে রিযিক দেন? তোমরা যে শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েছো এগুলো কার ইখতিয়ারভুক্ত? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্বব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন? এরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" (৩১ আয়াত)।

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যখন তোমরা জাহাজে আরোহণ করে অনুকূল বাতাসে আনন্দ চিত্তে সফর করতে থাকো আর তারপর হঠাৎ প্রতিকূল বাতাসের বেগ বেড়ে যায়, চারদিক থেকে তরংগ আঘাত করতে থাকে এবং মুসাফিররা মনে করতে থাকে, তারা চারদিক থেকে ঝনঝা পরিবৃত হয়ে পড়েছে, তখন সবাই নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁরই কাছে দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ "হে আল্লাহ যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এই লোকেরাই সত্যচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"

সূরা বনী ইসরাঈলে একথাটিরই পুনরাবৃত্তি এভাবে করা হয়েছে ঃ "যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (৬৭ আয়াত)।

এ আয়াতগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য আপনি আমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন? তিনি এর জবাবে বললেন ঃ هُوَ اللّٰهُ তিনি আল্লাহ। এ জবাব থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়, যাকে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ও সারা বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, প্রভু, আহারদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে মানো এবং কঠিন সংকটময় মুহূর্তে অন্য সব মাবুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য করার

www.icsbook.info

আবেদন জানাও, তিনিই আমার রব এবং তাঁরই ইবাদাত করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংগ গুণাবলী আপনা আপনি এসে পড়ে। কারণ যিনি এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা, যিনি এর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, যিনি এর মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহার যোগান এবং বিপদের সময় নিজের বান্দাদের সাহায্য করেন তিনি জীবিত নন, শুনতে ও দেখতে পান না, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী নন, করুণাময় ও স্নেহশীল নন এবং সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নন, একথা আদতে কল্পনাই করা যায় না।

৩. ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে উলামায়ে কেরাম هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে যে বিশ্লেষণটি এখানকার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় সেটি হচ্ছে ঃ هُوَ উদ্দেশ্য (Subject) اَللّٰهُ তার বিধেয় (Predicate) এবং اَحَدٌ তার দ্বিতীয় বিধেয়। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক। অন্য অর্থ এও হতে পারে এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ এক।

এখানে সর্বপ্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য "আহাদ" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অস্বাভাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ يَوْمُ الْاَحَدِ "সপ্তাহের প্রথম দিন।" অনুরূপভাবে فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ "তোমাদের কোন একজনকে পাঠাও।" অথবা সাধারণ নেতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন ঃ مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ "আমার কাছে কেউ আসেনি।" কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন ঃ هَلْ عِنْدَكَ اَحَدٌ "তোমার কাছে কি কেউ আছে?" অথবা এ ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয় যেমন ঃ اِنْ جَاءَكَ اَحَدٌ "যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।" অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন ঃ اَحَدٌ ، اِثْنَانِ ، اَحَدٌ عَشَرَ "এক, দুই, এগার।" এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ (আহাদ) শব্দটির গুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের গুণ প্রকাশ অর্থে "আহাদ" শব্দের ব্যবহারের কোন নজির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ গুণ। বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন, هُوَ اللّٰهُ বলার পর اَحَدٌ বলে কিভাবে তার জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে, তিনি একাই রব। তাঁর 'রবুবিয়াতে' কারো কোন অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই 'উলুহীয়াতে'ও (মাবুদ হবার গুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

www.icsbook.info

দ্বিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্ব-রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্ব-ব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের রিযিক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোন অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরি? তাঁর বংশধারা কি? তিনি কোন প্রজাতির অন্তরভুক্ত? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন? এবং তাঁর পর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র "আহাদ" শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে : (১) তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোন প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক واحد এক নয় বরং احد একক, যেখানে কোন দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোন সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে না। তার কোন আকার ও রূপ নেই। তা কোন স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোন বর্ণ নেই। কোন অংগ-প্রত্যংগ নেই। কোন দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণ মুক্ত ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় "ওয়াহেদ" শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনভাবে আমাদের ভাষায় আমরা "এক" শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুল সংখ্যা সম্বলিত কোন সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে "ওয়াহেদ" বা "এক" বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, এক জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্ব-জাহানও। আবার কোন সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও "এক"-ই বলা হয়। কিন্তু "আহাদ" বা একক শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে : "ইলাহুন ওয়াহেদ" এক মাবুদ বা "আল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহ্হার"—এক আল্লাহই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক "ওয়াহেদ" বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ।

৪. মূলে "সামাদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ص م د ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন : الصمد মনস্থ করা, ইচ্ছা করা। বিপুলায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুল ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা। উচ্চ

www.icsbook.info

সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপসার্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরাণাপন্ন হতে হয়।

اَلصَّمَدُ ঃ প্রত্যেক জিনিসের উঁচু অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না। অভাবীরা যে নেতার শরণাপন্ন হয়। চিরন্তন। উন্নত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিচ্ছিদ্র যার মধ্যে কোন ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার শিকার হয় না।

اَلْمُصْمَدُ ঃ জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

اَلْمُصَمَّدُ ঃ যে লক্ষের দিকে যেতে মনস্থ করা হয়; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

بَيْتٌ مُصَمَّدٌ ঃ এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءٌ مُصَمَّدٌ ঃ উঁচু ইমারত।

صَمَدَهُ وَصَمَدَ اِلَيْهِ صَمْدًا ঃ ঐ লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

اَصْمَدَ اِلَيْهِ الْاَمْرَ ঃ ব্যাপারটি তার হাতে সোপর্দ করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্থা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামূস ও লিসানুল আরব)।

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে "আল্লাহুস সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তীকালের আলেমগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি ঃ

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন ঃ সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন ঃ তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে ঃ লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে ঃ যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কোনদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সে-ই সামাদ। এরই সমার্থবোধক উক্তি সা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

www.icsbook.info

সুদ্দী বলেছেন ঃ আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ যার ওপর কখনো বিপদ-আপদ আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন ঃ যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন ঃ অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুররাতুল হামদানী।

মুররাতুল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে ঃ যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হুকুম ও ফায়সালা পূনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন ঃ যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবায়ী বলেছেন ঃ সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার ওপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আয যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন ঃ যার ওপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম বাক্যে "আল্লাহ আহাদ" কেন বলা হয়েছে এবং এ বাক্যে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে কেন? "আহাদ" শব্দটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে "আহাদুন" শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই "আল্লাহ সামাদুন" না বলে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়। তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত। যে কোন সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি

www.icsbook.info

জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি নিছক "সামাদ" নন, বরং "আসসামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি "আসসামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আসসামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, "আসসামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না।

৫. মুশরিকরা প্রতি যুগে খোদায়ীর এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মজীদে আরববাসীদের আকীদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। তাদের জাহেলী চিন্তা নবীগণের উম্মাতদেরকেও সংরক্ষিত রাখেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের সৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার আকীদা জন্ম নেয়। এ বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক চিন্তা-বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় মিশ্রিত হতে থেকেছে। কিছু লোক মনে করেছে, যাদেরকে তারা আল্লাহর সন্তান গণ্য করছে তারা সেই মহান পবিত্র সত্তার ঔরসজাত সন্তান। আবার কেউ কেউ দাবী করেছে, যাকে তারা আল্লাহর সন্তান বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাআ'যাল্লাহ) আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সত্তা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের দায়িত্বমুক্ত নন এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অস্তিত্ব, তাঁর ঔরসে সন্তান জন্মলাভ করে এবং অপুত্রক হলে তার কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাঁকেও কারো সন্তান মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর বংশধারা কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, কার কাছ থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এর উত্তরাধিকারী হবে কে?

www.icsbook.info

এসব জাহেলী মূর্খতা প্রসূত ধারণা-কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন ঃ

এক ঃ আল্লাহ এক নয়, বরং আল্লাহর কোন একটি জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যরা আল্লাহর গুণাবলী, কার্যকলাপ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক। আল্লাহর কেবলমাত্র ঔরসজাত সন্তান ধারণা করে নিলে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে ধারণা করে নিলেও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কারো পালকপুত্র অবশ্যি তারই সমজাতীয় ও সমগোত্রীয়ই হতে পারে। আর (মা'আযাল্লাহ) যখন সে আল্লাহর সমজাতীয় ও সমগোত্রীয় হয়, তখনই সে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্নও হবে, একথা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দুই ঃ পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া কোন সন্তানের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। বাপ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সন্তানের রূপ লাভ করে—সন্তান বলতে একথাই বুঝায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তান ধারণা করার ফলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর একটি বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব, তাঁর সমজাতীয় কোন স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং তার শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন ঃ সন্তান উৎপাদন ও বংশধারা চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, ব্যক্তিরা হয় মরণশীল এবং তাদের জাতির ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সন্তান উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সন্তানদের সাহায্যেই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করলে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নিজে যে মরণশীল এবং তাঁর বংশ ও তাঁর নিজের সত্তা কোনটিই চিরন্তন নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত মরণশীল ব্যক্তির মতো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহরও কোন শুরু ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের ওপর যেসব জাতি ও গোত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিবর্গ অনাদি-অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চার ঃ কারো পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সন্তানহীন ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কারো সাহায্যের এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন একথা মনে করা হলে সেই পবিত্র সত্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো মরণশীল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আল্লাহকে "আহাদ" ও "আসসামাদ" বললে এসব উদ্ভট ধারণা-কল্পনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়, তবুও এরপর "না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান"—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তরভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ

www.icsbook.info

বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – النساء : ١٧١

"আল্লাহ–ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত–পাক–পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আন নিসা, ১৭১)

اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।" (আস সাফ্‌ফাত, ১৫১–১৫২)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ

"তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।"
(আস সাফফাত, ১৫৮)

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ –

"লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" (আয্ যুখরুফ, ১৫)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۛ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ – الانعام : ١٠٠ – ١٠١

"আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে–বুঝে তাঁর জন্য পুত্র–কন্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।" (আল আনআম, ১০০–১০১)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক–পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে।" (আল আম্বিয়া, ২৬)

www.icsbook.info

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক–পবিত্র। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" (ইউনুস, ৬৮)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ ـ

"আর হে নবী! বলে দাও, সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" (বনী ইসরাঈল, ১১১)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ـ

"আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন ইলাহও নেই।" (আল মু'মিনূন, ৯১)

যারা আল্লাহর জন্য ঔরসজাত সন্তান অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা–বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে বলা হয়েছে কুফূ (كفو) এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশে কুফূ শব্দের ব্যবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছেলের ও মেয়ের সমান পর্যায়ে অবস্থান করা। কাজেই এখানে এ আয়াতের মানে হচ্ছে ঃ সারা বিশ্ব–জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যাদা সম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।

---

www.icsbook.info

মু'আওবিযাতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম "মু'আওবিযাতাইন" (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়েলে নবুওয়াত" বইতে লিখেছেন ঃ এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে "মু'আওবিযাতাইন"। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

"তোমরা কি কোন খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়েতগুলো এ

www.icsbook.info

বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বায়হাকী, হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী, আবদ ইবনে হুমায়েদ এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ইহুদিরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছেল। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিল, তারপর কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমের। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীমের (সা) বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হুকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাস্‌সির এ সূরা দু'টিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্‌যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষপটে এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরূনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন—যাদের বন্দেগী তোমরা করছো

www.icsbook.info

আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু-টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জন-মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় ঃ "আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।" (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

"আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না" (আল মু'মিন, ২৭)

www.icsbook.info

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ

"আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।" (আদ দুখান, ২০)।

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিপুল উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শক্তিশালী দুশমনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্যের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের মোকাবেলা করার মতো কোন বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা "তোমাদের মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি" এই বলে দুশমনদের হুমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কূট কৌশল ও শত্রুতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে ঃ সত্যের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তার কোন পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিষ্কার করে দিতে চাই । এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নূ'আইম, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে

www.icsbook.info

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির এবং (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমুক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো বড় সাহাবী যখন এই মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দু'টি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন–পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাকেল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোন কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোন সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষারোপ হচ্ছে তার জবাব কি ? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হাফেয বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই ঃ সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি লিখিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রা) একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মোকাবেলায় কোন মূল্যই রাখে না।

চার ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন,

www.icsbook.info

অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সূরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বরাত দিয়ে আমরা হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন ঃ আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিব্বানও এই হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন ঃ "যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সূরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।" সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) ফজরের নামাযে এ সূরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (সা) তাঁকে বলেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সূরা পড়তে থাকবে। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ "লোকেরা যে সূরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শেখাবো না? তিনি আরজ করেন, অবশ্যি শিখাবেন। হে আল্লার রসূল! একথায় তিনি তাকে এ আল ফালাক ও আন নাস সূরা দু'টি পড়ান। তারপর নামায দাঁড়িয়ে যায় এবং নবী করীম (সা) এ সূরা দু'টি তাতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ "হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি?" এরপর তাকে হিদায়াত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সূরা দু'টি পড়ো। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর "মুআওবিযাত" (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করিম (সা) সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত রেখে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সূরা হূদ সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দেবেন? বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক–এর চাইতে বেশী বেশী উপকারী আর কোন জিনিস নেই।" নাসাঈ, বায়হাকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আদুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আশ্রয় প্রার্থীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনগুলো?" আমি বললাম, অবশ্যি বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন ঃ "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" সূরা দু'টি।" ইবনে মারদুইয়া হযরত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যে সূরাগুলো সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন তা হচ্ছে", কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

www.icsbook.info

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ ধরনের ভুল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আমরা এর জবাব পেতে পারি।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হুকুম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে যির ইবনে জুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উবাইকে (রা) বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, 'কুল' (বলো), কাজেই আমিও বলেছি 'কুল।' তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন।" ইমাম আহমাদের বর্ণনা মতে হযরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিব্রীল (আ) 'কুল আউজু বিরব্বিন নাস' বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল (সা) যেভাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।" এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উভয় সূরায় 'কুল' (বলো) শব্দ দেখে এ ভুল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আউযু বিরব্বিল ফালাক (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) ও "আউযু বিরব্বিন নাস" (আমি সমস্ত মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করিমকে (সা)–এর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূলের (সা) সামেনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ জিব্রীল আলাইহিস সালাম যেহেতু 'কুল' বলেছিলেন তাই আমিও 'কুল' বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হুকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।" বরং সে ক্ষেত্রে 'বলো' শব্দটি বাদ দিয়ে "আমি আশ্রয় চাচ্ছি' বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি" এবং এ পয়গাম তার নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি লোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো, হুবহু পৌঁছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোন একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা 'কুল' শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি অহীর কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক

www.icsbook.info

সেভাবেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হুকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অহীর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করিম (সা)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল হুবহু সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সংযোজিত করতেন না। বরং এ হুকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিন্তা–ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামকে ভুল–ত্রুটি মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোন কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাথেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অর্থহীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোন ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই–বাছাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদে মুখর হবে সে হবে একজন মস্তবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অস্বীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী করীমের (সা) ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কতটা যাদুর প্রভাবে ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে

www.icsbook.info

ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংঘর্ষশীল। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে ঃ

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا -

"জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।" (বনি ইসরাঈল, ৪৭) আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উত্থাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হুবহু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৃহীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সম্ভাবনার কোন পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোন একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অমুক অমুক ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে এ অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে,

www.icsbook.info

এর এক একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'–এর পর্যায়ভুক্ত হলেও মূল বিষয়বস্তুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং একসাথে গ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরছি।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনি যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।[১] তারা তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চাইতে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মাদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহর (সা) চিরুনীর একটি টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরুনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে— তার বোনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণের[২] নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী–আযওয়ান নামক কূয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেলো। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোন কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোন কোন সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোন জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও

১. কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তরভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোন গোত্র ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল খাযরাজদের অন্তরভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।

২. শুরুতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পুরুষ খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রক্তের মতো। তার গন্ধ হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

www.icsbook.info

পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোন একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কোন আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোন পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। অথবা এমন কোন কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর ওপর নাযিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোন নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে তিনি মনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথচ আসলে তা পড়েননি। নাউযুবিল্লাহ, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে নবীকে কেউ কাৎ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমুন্নত থেকেছে। তার ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হযরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আশেয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, "দু'জন লোক (অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা দু'জন লোকের আকৃতি ধরে) আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এঁর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে আবৃত চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কূয়া যী-আযওয়ানের (অথবা যী-যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এ জন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কূয়ার পানি সেঁচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে ইয়াসির (রা) ও হযরত যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হযরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আযযুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আযযুরাকী (অর্থাৎ বনি যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী (সা) নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কূয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তার মধ্যে চিরুনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তার গায়ে কয়েকটি সুঁই ফুটানো ছিল। জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুঁইও তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুঁই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যেমন কোন ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তারপর তার বাঁধন খুলে গেলো। তারপর তিনি লাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তার দোষ স্বীকার করলো এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য তিনি কোনদিন কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি।

www.icsbook.info

শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথাবার্তা বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিচ্ছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সাথে যে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও তার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসা (আ)–এর মোকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মোকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো (سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ) । সূরা ত্বা–হায় বলা হয়েছে ঃ তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই মর্মে অহী নাযিল করলেন যে, ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুঁড়ে ফেলো।

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى - قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ – طٰهٰ : ٦٦-٦٩

এখানে যদি আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের গল্প শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয় ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তার ওপর পড়েছিল, তাঁর নবীসত্তা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোন বিষয়ের সাথে এ আপত্তি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কাল্পনিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে

www.icsbook.info

ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভয় একটি মনস্তাত্ত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বুঝি প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন হয়েছে। হযরত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হযরত মূসার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে : বেবিলনে হারুত ও মারুতের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের গুলী ও বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিচ্ছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়-ফুঁকের কোন অবকাশ আছে? তাছাড়া জাড়-ফুঁক যথার্থই কোন প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল ফালাক ও আন নাস এবং কোন কোন হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিন বার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে—সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষ বারে রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হযরত আয়েশা (রা) এ সূরাগুলো (স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা নবী করীমের হুকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত রেওয়ায়াত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর রসূলের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর চাইতে আর কারো বেশী জানার কথা নয়।

www.icsbook.info

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীটি ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না জাড়–ফুঁক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। (মুসলিম) হযরত মুগীরা ইবনে শোবার (রা) বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়–ফুঁক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থেকে সম্পর্ক হয়ে গেলো। (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়–ফুঁক করা, তবে সূরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সূরা ইখলাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। কোন কোন হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম (সা) ঝাড় ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিছেলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ এতে কোন শিরকের আমেজ থাকতে পারবে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়–ফুঁক করতে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোন গুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সঙ্গে ভরসা জাড়–ফুঁকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়–ফুঁকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীমকে (সা) বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবন আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছিল সেখানে নোনতা পানি দিয়ে ডলতে থাকেন আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস পড়তে থাকেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন ঃ

اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ -

"আমি তোমাদের দু'জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

(বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা

www.icsbook.info

হয়েছে ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী (সা) বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি ভীত।" মুআত্তায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিব্রীল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?" জবাব দেন হাঁ জিব্রীল বলেন,

بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ -

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও হিংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে গেলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিব্রীল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হাদীসে উদ্ধৃত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা (রা) বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

* ভদ্র মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হযরত উমরও (রা) এ বংশের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হযরত হাফসার (রা) আত্মীয়া।

www.icsbook.info

তিনি পিঁপড়া বা মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করতেন। রসূলে করীম (সা) বলেন : হাফসাকেও এ আমল শিখিয়ে দাও। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছো তেমনিভাবে এ ঝাড়-ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন : জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল ছিল যার সাহায্যে আমরা বিছু (বা সাপ) কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাঁকে শুনালো। তিনি বললেন, "এর মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যি তা করা উচিত।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : হাযম পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা প্রক্রিয়া জানতো। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিও একথা সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিমেও হযরত আনাস (রা) থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বিষাক্ত প্রাণীদের কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও নজর লাগার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম হযরত উমাইর মাওলা আবীল লাহাম (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি আমল জানতাম। তার সাহায্যে আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, উমুক উমুক জিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি ঝাড়তে পারো।

মুয়াত্তায় বলা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়ো। এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইঞ্জিলের আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে তাহলে তা জায়েয।

www.icsbook.info

এখন ঝাড়-ফুঁক উপকারী কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল (সা) নিজেও লোকদেরকে কোন কোন রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত "কিতাবুত তিব" (চিকিৎসা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিৎসা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রুগীও মরতো না। এখন চিকিৎসা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হুসনা (ভালো ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র বস্তুবাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী মনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়-ফুঁকের ওপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল লোককে মাদুলি তাবীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু'পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারীতে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রসূলে করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তারা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোন ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত

* বস্তুবাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপারে দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ষোল ঘন্টা পর্যন্ত পেশাব আটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি জালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমিই আমার চিকিৎসা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তাকে বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু'পায়ের গোছায় দাদে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোন রকম চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছিলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোন প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধ ছাড়াই সমস্ত দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

www.icsbook.info

আবু সাঈদ বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছো, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোন কোন বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হযরত আবু সাঈদ সরদারের কাছে যান। তার ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশেষে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা তাতো জানা নেই। কাজেই তাঁরা নবী করীমের (সা) কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রমাণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এ কাজ করেছিলেন। রসূলে করীমও (সা) একে শুধু জায়েযই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ রাখার হুকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয ও নাজায়েয হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল চলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে কোন হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌঁছে যে খাবার-দাবার কিনে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পরে বিনিময়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজী হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর ওপর ভরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাঁদের সামনে হাযির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন।

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) যে এ আমলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকাংশে হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এমন কি হযরত আবু সাঈদ নিজে এ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে এ দু'টি কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) যে রেওয়ায়াত আছে তাতে রসূলে করীমের (সা!) বক্তব্যে বলা হয়েছে ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتب الله তোমরা অন্য কোন আমল না করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এভাবে আরবের সংশ্লিষ্ট গোত্রটির ওপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে। যারা শহরে ও গ্রামে বসে ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুযুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর আয়াত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্তি হয় আল ফালাক ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাব্বুল আলামীন, রহমান রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে বান্দা নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দেগী করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানব জাতির রব, মানব জাতির বাদশাহ ও মানব জাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানব জাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই সূরার যে সম্পর্ক তা কোন গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

www.icsbook.info

আয়াত ৫ **সূরা আল ফালাক-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۗ﴿۵﴾

বলো,[১] আশ্রয় চাচ্ছি[২] আমি প্রভাতের রবের,[৩] এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।[৪] এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[৫] আর গিরায় ফুঁৎকারদানকারীদের (বা কারিনীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।[৬] এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৭]

১. রিসালাতের প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে পয়গাম নাযিল হয় قُلْ (বলো) শব্দটি যেহেতু তার একটি অংশ, তাই একথাটি প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হলেও তার পরে প্রত্যেক মু'মিনও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়।

২. আশ্রয় চাওয়া কাজটির তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এক, আশ্রয় চাওয়া। দুই, যে আশ্রয় চায়। তিন, যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আশ্রয় চাওয়ার অর্থ, কোন জিনিসের ব্যাপারে ভয়ের অনুভূতি জাগার কারণে নিজেকে তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কারো হেফাজতে চলে যাওয়া, তার অন্তরাল গ্রহণ করা, তাকে জড়িয়ে ধরা বা তার ছায়ায় চলে যাওয়া। আশ্রয়প্রার্থী অবশ্যি এমন এক ব্যক্তি হয়, যে অনুভব করে যে, সে যে জিনিসের ভয়ে ভীত তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার নেই। বরং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর যার আশ্রয় চাওয়া হয় সে অবশ্যি এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা সত্তা হয় যার ব্যাপারে আশ্রয় গ্রহণকারী মনে করে সেই ভয়ংকর জিনিস থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে। এখন এক প্রকার আশ্রয়ের প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কার্যকারণের জগতে কোন অনুভূত জড় পদার্থ, ব্যক্তি বা শক্তির কাছে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গের আশ্রয় নেয়া, গোলাগুলীর বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পরিখা, বালি ভর্তি থলের প্রাচীর বা

www.icsbook.info

ইটের দেয়ালের আড়াল নেয়া, কোন শক্তিশালী জালেমের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোন গাছ বা দালানের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রয় হচ্ছে, প্রত্যেক ধরনের বিপদ, প্রত্যেক ধরনের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে কোন অতি প্রাকৃতিক সত্তার আশ্রয় এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অননুভূত পদ্ধতিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবশ্যি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শুধু এখানেই নয়, কুরআন ও হাদীসের যেখানেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কথা এসেছে, সেখানেই এ বিশেষ ধরনের আশ্রয় চাওয়ার অর্থেই তা বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা না করাটাই তাওহীদী বিশ্বাসের অপরিহার্য অংগ। মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সত্তা যেমন জিন, দেবী ও দেবতাদের কাছে এ ধরনের আশ্রয় চাইতো এবং আজো চায়। বস্তুবাদীরা এ জন্য বস্তুগত উপায়-উপকরণের দিকে মুখ ফিরায়। কারণ, তারা কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মু'মিন যেসব আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবতের মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে। উদাহরণ স্বরূপ মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ -

"আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানব জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোক জিন জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬) এর ব্যাখ্যায় আমরা সূরা জিনের ৭ টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। তাতে বলা হয়েছে ঃ আরব মুশরিকদের যখন কোন রাতে কোন জনমানবহীন উপত্যকায় রাত কাটাতে হতো তখন তারা চিৎকার করে বলতো ঃ "আমরা এ উপত্যকার রবের (অর্থাৎ এ উপত্যকার ওপর কর্তৃত্বশালী জিন বা এ উপত্যকার মালিক) আশ্রয় চাচ্ছি।" অন্যদিকে, ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসার (আ) পেশকৃত মহান নিশানীগুলো দেখে (فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ) "নিজের শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করে সে সদর্পে নিজের ঘাড় ঘুরিয়ে থাকলো।" (আয যারিয়াত, ৩৯)। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ তারা বস্তগত, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই হযরত মারয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এলেন (তিনি তাঁকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

"যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" (মারয়াম, ১৮) হযরত নূহ (আ) যখন আল্লাহর কাছে অবাস্তব দোয়া করলেন এবং জবাবে আল্লাহ তাঁকে শাসালেন তখন তিনি সংগে সংগেই আবেদন জানালেন ঃ

www.icsbook.info

رَبِّ اِنِّىٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ

"হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।" (হুদ, ৪৭) হযরত মূসা (আ) যখন বনি ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"আমি মূর্খ–অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।"

(আল বাকারাহ, ৬৭)

হাদীস গ্রন্থগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো এ একই পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত দোয়াগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ (مسلم)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দোয়াগুলোতে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই।" (মুসলিম)

عن ابن عمر رض كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاَةِ نِقْمَتِكَ

وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (مسلم)

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া ছিল ঃ হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عن زيدبن ارقم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللّٰهُمَّ

www.icsbook.info

اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَّتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ (مسلم)

"যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দোয়া কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عَنْ ابى هريرة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (ابو داود)

'হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ, মানুষ যেসব জিনিসের সাথে রাত অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে ক্ষুধা সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর আত্মসাৎ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ এটা বড়ই কলুষিত হৃদয়ের পরিচায়ক।" (আবু দাউদ)।

عَنْ انس ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ (ابو داود)

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ)

عن عائشة ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكمات اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ –

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো সহ দোয়া চাইতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আগুনের ফিত্না এবং ধনী ও দরিদ্র হওয়ার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن قطبة بن مالك كان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ (ترمزى)

"কুতবাহ ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অসৎ চরিত্র, অসৎ কাজ ও অসৎ ইচ্ছা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

www.icsbook.info

শাকাল ইবনে হুমাইদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমাকে কোন দোয়া বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার বাকশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার যৌন ক্ষমতার অনিষ্ট থেকে।" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن انس بن مالك كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (وفى رواية لمسلم) وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (بخارى ومسلم)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, কুড়েমি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) আর ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকেরা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ خَوْلَةَ بنت حُكَيم السُّلَمِيَّة سمعتُ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عَلَيْهِ وَسلم يقول مَنْ نَّزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّه شَىْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ (مسلم)

"খাওলা বিনতে হুকাইম সুলামীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন নতুন মনযিলে নেমে একথাগুলো বলবে—আমি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর নিষ্কলংক কালেমাসমূহের আশ্রয় চাই, সেই মনযিল থেকে রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।" (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন হাদীস থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম। এ থেকে জানা যাবে, প্রতিটি বিপদ–আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবেলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয়

www.icsbook.info

চাওয়াই মু'মিনের কাজ। অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

৩. মূলে رَبُّ الْفَلَقِ (রব্বিল ফালাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ফালাক" শব্দের আসল মানে হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ এ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন, রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতার উদয় হওয়া। কারণ, আরবীতে "ফালাকুস সুবহ" (فَلَقُ الصبح) শব্দ "প্রভাতের উদয়" অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও মহান আল্লাহর জন্য فَالِقُ الْاِصْبَاحِ (ফালেকুল ইসবাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে, "যিনি রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের উদয় করেন।" (আল আন'আম, ৯৬) "ফালাক" শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সৃষ্টি করা। কারণ দুনিয়ায় যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, সবগুলোই কোন না কোন জিনিস ভেদ করে বের হয়। বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়। সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়। সমস্ত ঝরণা ও নদী পাহাড় বা মাটি চিরে বের হয়। দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে। বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। মোটকথা, অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি জিনিস কোন না কোনভাবে আবরণ ভেদ করার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ মণ্ডলও প্রথমে একটি স্তূপ ছিল। তারপর তাকে বিদীর্ণ করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا এ আকাশ ও পৃথিবী সবকিছুই স্তূপীকৃত ছিল, পরে আমি এদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। (আল আম্বিয়া, ৩০) কাজেই এ অর্থের প্রেক্ষিতে ফালাক শব্দটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাচ্ছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। এখানে আল্লাহর মূল সত্তাবাচক নাম ব্যবহার না করে তাঁর গুণবাচক নাম "রব" ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, আশ্রয় চাওয়ার সাথে আল্লাহর "রব" অর্থাৎ মালিক, প্রতিপালক, প্রভু ও পরওয়ারদিগার হবার গুণাবলীই বেশী সম্পর্ক রাখে। তাছাড়া "রব্বুল ফালাক" এর অর্থ যদি প্রভাতের রব ধরা হয় তাহলে তাঁর আশ্রয় চাওয়ার মানে হবে, যে রব অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে প্রভাতের আলো বের করে আনেন আমি তাঁর আশ্রয় নিচ্ছি। এর ফলে তিনি বিপদের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যদি এর অর্থ সৃষ্টিজগতের রব ধরা হয়, তাহলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টির মালিকের আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি নিজের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।

৪. অন্য কথায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এ বাক্যে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি

www.icsbook.info

করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যদি শুধু একটি মাত্র বাক্য বলেই বক্তব্য শেষ করে দেয়া হতো এবং পরবর্তী বাক্যগুলোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা নাই–বা বলা হতো তাহলেও এ বাক্যটি বক্তব্য বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এখানে সমস্ত সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নেয়া হয়েছে। এই ব্যাপকভাবে আশ্রয় চাওয়ার পর আবার কতিপয় বিশেষ অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, আমি স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি, তবে বিশেষভাবে সূরা আল ফালাকের অবশিষ্ট আয়াতসমূহে ও সূরা আন নাসে যেসব অনিষ্টকারিতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এমন পর্যায়ের যা থেকে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের বড় বেশী মুখাপেক্ষী।

তৃতীয়ত, সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ লাভ করার জন্য সবচেয়ে সংগত ও প্রভাবশালী আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপার যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হচ্ছে তাদের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ, তিনি সব অবস্থায় নিজের সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। তিনি তাদের এমন সব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানেন যেগুলো আমরা জানি, আবার আমরা জানিনা এমনসব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর আশ্রয় হবে, যেন এমন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে আমরা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা–অজানা অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাছাড়া কেবল দুনিয়ারই নয়, আখেরাতের সকল অনিষ্টকারিতা থেকেও পানাহ চাওয়াও এর অন্তরভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত, অনিষ্টকারিতা শব্দটি ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারণে ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় সে জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন রোগ, অনাহার, কোন যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ–বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা দংশিত হওয়া, সন্তানের মৃত্যু শোকে কাতর হওয়া এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য অনিষ্টকারিতা প্রথমোক্ত অর্থের অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলো যথার্থই কষ্ট ও যন্ত্রণা। অন্যদিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুফরী, শিরক এবং যেসব ধরনের গোনাহ ও জুলুম দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলোর পরিণাম কষ্ট ও যন্ত্রণা। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এগুলো সাময়িকভাবে কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় না বরং কোন কোন গোনাহ বেশ আরামের। সেসব গানাহ করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং লাভের অংকটাও হাতিয়ে নেয়া যায়। কাজেই এ দু'অর্থেই অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়।

পঞ্চমত, অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি অর্থও রয়েছে। যে অনিষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তাকে খতম করে দাও। আর যে অনিষ্ট এখনো হয়নি, তার সম্পর্কে বান্দা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! এ অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

www.icsbook.info

৫. সৃষ্টিজগতের অনিষ্টকারিতা থেকে সাধারণভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার পর এবার কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষভাবে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মূল আয়াতে غَسَقٍ اِذَا وَقَبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গাসেক' (غاسق) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ "নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত।" (বনি ইসরাঈল, ৭৮)

আর 'ওয়া কাবা' (وَقَبَ) মানে হচ্ছে, প্রবেশ করা বা ছেয়ে যাওয়া। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ অপরাধ ও জুলুম রাতের অন্ধকারেই সংঘটিত হয়। হিংস্র জীবেরাও রাতের আঁধারেই বের হয়। আর এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় আরবে রাজনৈতিক অরাজকতা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তাতে রাতের চিত্র তো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে লুটেরা ও আক্রমণকারীরা বের হতো। তারা জনবসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো লুটতরাজ ও খুনাখুনি করার জন্য যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের চেষ্টা করছিল, তারাও রাতের আঁধারেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কারণ, এভাবে হত্যাকারীকে চেনা যাবে না। ফলে তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে আঁধার রাতের অনিষ্টকারিতা থেকে প্রভাতের রবের আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম সম্পর্ক রয়েছে তা কোন গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকার কথা নয়।

এ আয়াতের ব্যাখার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও ঃ هٰذَا الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইযা ওয়াকাব (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া)। এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ইযা ওয়াকাব (اِذَا وَقَبَ) মানে হচ্ছে এখানে اِذَا خَسَفَ (ইযা খাসাকা) অর্থাৎ যখন তার গ্রহণ হয়ে যায় অথবা চন্দ্রগ্রহণ তাকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদের দিকে এভাবে ইশারা করেছিলেন তখন চন্দ্রগ্রহণ চলছিল। আরবী আভিধানিক অর্থেও اِذَا وَقَبَ কখনো اِذَا خَسَفَ হয় না। তাই আমার মতে এ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রসূলুল্লাহ (সা) উক্তির অর্থ হচ্ছে—এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, চাঁদের আলো আত্মরক্ষাকারীর জন্য ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় আক্রমণকারীর জন্য আর তা অপরাধীকে যতটুকু সহায়তা করে, যে অপরাধের শিকার হয় তাকে ততটুকু সহায়তা করে না। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

www.icsbook.info

اِنَّ الشَّمْسَ اِذَا غَرَبَتْ انتشرت الشياطين فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء –

"যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো, যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।"

৬. মূলে نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। 'উকাদ' (عُقَد) শব্দটি "উকদাতুন" (عقدة) শব্দের বহুবচন। এর মানে হচ্ছে গিরা। যেমন সূতা বা রশিতে যে গিরা দেয়া হয়। নাফস (نفث) মানে ফুঁক দেয়া। নাফফাসাত (نَفّٰثٰت) হচ্ছে নাফফাসাহ (نفاثة)-এর বহুবচন। এ শব্দটিকে علامة এর ওজনে ধরা হলে এর অর্থ হবে খুব বেশী ফুঁকদানকারী। আর স্ত্রীলিংগে এর অর্থ করলে দাঁড়ায় খুব বেশী ফুঁকদানকারিনীরা অথবা ফুঁকদানকারী ব্যক্তিবর্গ বা দলেরা। কারণ আরবীতে "নফস" (ব্যক্তি) ও "জামায়াত" (দল) স্ত্রীলিংগ অধিকাংশ তথা সকল মুফাস্‌সিরের মতে গিরায় ফুঁক দেয়া শব্দটি যাদুর জন্য রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, যাদুকর সাধারণত কোন সূতায় বা ডোরে গিরা দিতে এবং তাতে ফুঁক দিতে থাকে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি পুরুষ যাদুকর বা মহিলা যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রভাতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন যাদু করা হয়েছিল, তখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসটি থেকেও ওপরের অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরা দু'টির এ একটি বাক্যই সরাসরি যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আবু মুসলিম ইসফাহানী ও যামাখশারী 'নাফফাসাত ফিল উকাদ' বাক্যাংশের অন্য একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, এর মানে হচ্ছে : মেয়েদের প্রতারণা এবং পুরুষদের সংকল্প, মতামত ও চিন্তা–ভাবনার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার। একে তারা তুলনা করেছেন যাদুকরের যাদুকর্মের সাথে। কারণ, মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে পুরুষদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেন মনে হয় কোন যাদুকর তাদেরকে যাদু করেছে। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত রসাত্মক হলেও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাদাতাগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, এটি সেই স্বীকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। আর ইতিপূর্বে আমরা ভূমিকায় এ দু'টি সূরা নাযিলের যে সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসেছি তার সাথে এর মিল নেই।

যাদুর ব্যাপারে অবশ্যি একথা জেনে নিতে হবে, এর মধ্যে অন্য লোকের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার জন্য শয়তান, প্রেতাত্মা বা নক্ষত্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। এ জন্য কুরআনে একে কুফরী বলা হয়েছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

"সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।" (আল বাকারা, ১০২) কিন্তু তার মধ্যে কোন কুফরী কালেমা বা শিরকী কাজ না থাকলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন সাতটি কবীরা গোনাহের অন্তরভুক্ত করেছেন, যা মানুষের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। এ

www.icsbook.info

প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকর জিনিস থেকে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণ নাশ হারাম করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া সেই প্রাণ নাশ করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করা, জিহাদে দুশমনের মোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সতীসাধ্বী মু'মিন মেয়েদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের দোষারোপ করা।

৭. হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক এ আশা করতে থাকে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে, অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এখানে হিংসুক যখন হিংসা করে অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ, যতক্ষণ সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ততক্ষণ তার জ্বালা-পোড়া তার নিজের জন্য খারাপ হলেও যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার জন্য এমন কোন অনিষ্টকারিতায় পরিণত হচ্ছে না, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন কোন হিংসুক থেকে এমন ধরনের অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে তখন তার হাত থেকে বাঁচার প্রধানতম কৌশল হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এই সাথে হিংসুকের অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসও সহায়ক হয়। এক, মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহ না চাইলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। দুই, হিংসুকের কথা শুনে সবর করবে। বেসবর হয়ে এমন কোন কথা বলবে না বা কাজ করতে থাকবে না, যার ফলে সে নিজেও নৈতিকভাবে হিংসুকের সাথে একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তিন, হিংসুক আল্লাহভীতি বিসর্জন দিয়ে বা চরম নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যতই অন্যায়-অশালীন আচরণ করতে থাকুক না কেন, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে যেন সবসময় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। চার, তার চিন্তা যেন কোন প্রকারে মনে ঠাঁই না দেয় এবং তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন সে নেই। কারণ, তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাওয়াই হিংসুকের হাতে পরাজয় বরণের পূর্ব লক্ষণ। পাঁচ, হিংসুকের সাথে অসদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কখনো যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে যে হিংসাকারীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যি তা করা উচিত। হিংসুকের মনে যে জ্বালাপোড়া চলছে, প্রতিপক্ষের এ সদ্ব্যবহারে তা কতটুকু প্রশমিত হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই! ছয়, যে ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে তাওহীদের আকীদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তার ওপর অবিচল থাকবে। কারণ, যে হৃদয়ে তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আল্লাহর ভয়ের সাথে অপর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

---

www.icsbook.info

আয়াত ৬ **সূরা আন নাস-মক্কী** রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۚ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ
فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে,[১] এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,[২] যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।[৩]

১. এখানেও সূরা আল ফালাকের মতো 'আউযু বিল্লাহ' বলে সরাসরি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে আল্লাহর তিনটি গুণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ তিনটি গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর রাব্বুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর মালিকুন নাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষের বাদশাহ, শাসক ও পরিচালক হওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে, তাঁর ইলাহুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মাবুদ হওয়া। (এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইলাহ শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, এমন বস্তু বা ব্যক্তি যার ইবাদাত গ্রহণ করার কোন অধিকারই নেই কিন্তু কার্যত তার ইবাদাত করা হচ্ছে। দুই, যার ইবাদাত গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং যিনি প্রকৃত মাবুদ, লোকেরা তার ইবাদাত করুক বা না করুক। (আল্লাহর জন্য যেখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

এ তিনটি গুণের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মানে হচ্ছে : আমি এমন এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যিনি সমস্ত মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ হবার কারণে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন, যিনি নিজের বান্দাদের হেফাজত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যথার্থই এমন অনিষ্টের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, যার হাত থেকে নিজে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচাবার জন্য আমি তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি। শুধু এতটুকুই নয় বরং যেহেতু তিনিই রব, বাদশাহ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আমি পানাহ চাইতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে যিনি পানাহ দেবার ক্ষমতা রাখেন।

www.icsbook.info

২. মূলে وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وسواس এর মানে হচ্ছে, বারবার প্ররোচনা দানকারী। আর "ওয়াসওয়াসাহ" মানে হচ্ছে, একের পর এক এমন পদ্ধতিতে মানুষের মনে কোন খারাপ কথা বসিয়ে দেয়া যে, যার মনে ঐ কথা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাহ সৃষ্টিকারী যে তার মনে ঐ কথা বসিয়ে দিচ্ছে তা সে অনুভবই করতে পারে না। ওয়াসওয়াসাহ শব্দের মধ্যেই বারবার হবার অর্থ রয়েছে, যেমন 'যালযালাহ' (ভূমিকম্প) শব্দটির মধ্যে রয়েছে, বারবার ভূকম্পনের ভাব। যেহেতু মানুষকে শুধুমাত্র একবার প্রতারণা করলেই সে প্রতারিত হয় না বরং তাকে প্রতারিত করার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'ওয়াসওয়াসাহ' (প্ররোচনা) এবং প্রচেষ্টাকারীকে 'ওয়াসওয়াস' (প্ররোচক) বলা হয়। এখানে আর একটি শব্দ এসেছে খান্নাস। خناس এর মূল হচ্ছে খুনূস। خنوس এর মানে প্রকাশিত হবার পর আবার গোপন হওয়া অথবা সামনে আসার পর আবার পিছিয়ে যাওয়া। আর "খান্নাস" যেহেতু বেশী ও অত্যধিক বৃদ্ধির অর্থবোধক শব্দ, তাই এর অর্থ হয়, এ কাজটি বেশী বেশী বা অত্যধিক সম্পন্নকারী। একথা সুস্পষ্ট, প্ররোচনাদানকারীকে প্ররোচনা দেবার জন্য বারবার মানুষের কাছে আসতে হয়। আবার এই সঙ্গে যখন তাকে খান্নাসও বলা হয়েছে তখন এ দু'টি শব্দ পরস্পর মিলিত হয়ে আপনা আপনি এ অর্থ সৃষ্টি করেছে যে, প্ররোচনা দান করতে করতে সে পিছনে সরে যায় এবং তারপর প্ররোচনা দেবার জন্য আবার বারবার ফিরে আসে। অন্য কথায় একবার তার প্ররোচনা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সে ফিরে যায়। তারপর সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য বারবার সে ফিরে আসে।

"বারবার ফিরে আসা প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট"–এর অর্থ বুঝে নেয়ার পর এখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ কি, একথা চিন্তা করতে হবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিজেই তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এ অনিষ্ট তার মনে যেন কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিই লোকদের মনে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে সত্যের আহবায়ক আল্লাহর আশ্রয় চায়। সত্যের আহবায়কের ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে যেসব লোকের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার নিজের পক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে খুঁটে খুঁটে তাদের প্রত্যেকের বিভ্রান্তি দূর করে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার যে কাজ সে করে যাচ্ছে তা বাদ দিয়ে প্ররোচনাকারীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার এবং তাদের অভিযোগের জবাব দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে তার নিজের পক্ষেও সে পর্যায়ে নেমে আসা তার মর্যাদার পরিপন্থি। তাই মহান আল্লাহ সত্যের আহবায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তারপর নিশ্চিন্তে নিজেদের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করো। এরপর এদের মোকাবেলা করা তোমাদের কাজ নয়, রবুন নাস, মালিকুন নাস ও ইলাহুন নাস সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাজ।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, ওয়াসওয়াসাহ বা প্ররোচনা হচ্ছে অনিষ্ট কর্মের সূচনা বিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসৎকাজ করার আকাংখা সৃষ্টি হয় তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাংখা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব

www.icsbook.info

বাড়তে থাকলে আরো সামনের দিকে গিয়ে অসৎ ইচ্ছা অসৎ সংকল্পে পরিণত হয়। আর তারপর এর শেষ পদক্ষেপ হয় অসৎকর্ম। তাই প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আল্লাহ যেন সেই স্থানেই তাকে নির্মূল করে দেন।

প্ররোচনা দানকারীদের অনিষ্টকারিতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শিরক, নাস্তিকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহপন্থীদের সাথে শত্রুতার উস্কানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবলম্বনের প্ররোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গোনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, ছোট ছোট সামান্য দু'চারটে গানাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ ছোট গানাহ–ই যদি বিপুল পরিমাণে করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গোনাহে মানুষ ডুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে শেষমেশ তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয় তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি দিতে ও উত্তেজিত করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ ও অভিযোগ–দোষারোপের ধারা বর্ষণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তার দুর্নাম রটাবার ও তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতে তাকে। তারপর শয়তান সে সেই মর্দে মু'মিনকে ক্রোধান্বিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে, এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেয়া তো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার এবং সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়ক এ ময়দান থেকেও যদি বিজয়ীর বেশে বের হয়ে আসে তাহলে শয়তান তার সামনে নিরুপায় হয়ে যায়। এ জিনিসটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমরা কোন উস্কানী অনুভব করো তাহলে আল্লাহর পানাহ চাও।" (হা–মীম সাজদাহ, ৩৬)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ –

"বলো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানী থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি।"
(আল মু'মিনূন, ৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, কখনো শয়তানের প্রভাবে কোন অসৎ চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে যায় এবং

www.icsbook.info

তারপর (সঠিক পথ) তাদের দৃষ্টি সমক্ষে পরিষ্কার ভেসে উঠতে থাকে।"

(আল আরাফ, ২০১)।

আর এ জন্যই যারা শয়তানের এই শেষ অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ করে দিয়ে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

"অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এ জিনিস লাভ করতে পারে না।"
(হা–মীম আস সাজদাহ, ৩৫)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সামনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই বাইর থেকে প্ররোচনা দেয় না বরং ভেতর থেকে মানুষের নিজের নফসও প্ররোচনা দেয়। তার নিজের ভ্রান্ত মতবাদ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ স্বার্থ–লালসা তার ইচ্ছা, সংকল্প, বিশ্লেষণ ও মীমাংসা করার ক্ষমতাকে অসৎপথে চালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শুধু নয়, মানুষের ভেতরের তার নিজের নফসের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। একথাটিকেই কুরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ "আর আমি তাদের নফস থেকে উদ্ভূত প্ররোচনাসমূহ জানি।" (কাফ, ১৬) এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বহুল প্রচারিত ভাষণে বলেন : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا "আমরা নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।"

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, প্ররোচণা দানকারীরা দুই ধরনের লোকদের মনে প্ররোচনা দান করে। এক, জিন এবং দুই, মানুষ। এ বক্তব্যটি মেনে নিলে এখানে নাস نَاس বলতে জিন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাঁরা বলেন, এমনটি হতে পারে। কারণ, কুরআনে যখন رِجَالٌ (পুরুষরা) শব্দটি জিনদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিনের ৬ আয়াতে দেখা যায় এবং যখন نَفَرٌ (দল) শব্দটির ব্যবহার জিনদের দলের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন সূরা আহকাফের ২৯ আয়াতে দেখা যায়, তখন পরোক্ষভাবে 'নাস' শব্দের মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল হতে পারে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ نَاس – اِنس ও اِنْسَانٌ শব্দগুলো আভিধানিক দিকে দিয়েই جِنّ (জিন) শব্দের বিপরীতধর্মী। জিন–এর আসল মানে হচ্ছে গোপন সৃষ্টি। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাকে জিন বলা হয়। বিপরীত পক্ষে 'নাস' ও 'ইনস' শব্দগুলো মানুষ অর্থে এ জন্য বলা হয় যে, তারা প্রকাশিত, তাদের চোখে দেখা যায় এবং ত্বক দিয়ে, অনুভব করা যায়। সূরা কাসাসের ২৯ আয়াতে اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا বলা হয়েছে। এখানে اٰنَسَ (আ–নাসা) মানে رَاٰى (রাআ) অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) "তূর পাহাড়ের কিনারে আগুন দেখেন।" সূরা আন নিসার ৬ আয়াতে বলা হয়েছে : فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا "যদি তোমরা অনুভব করো, এতিম শিশুদের এখন বুঝসুঝ হয়েছে।

اٰنَسْتُمْ (আ–নাসতুম) মানে اَحْسَسْتُمْ (আহসাসতুম) বা رَاَيْتُمْ (রাআইতুম)। কাজেই আরবী ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'নাস' শব্দটির মানে জিন হতে পারে না।

www.icsbook.info

তাই এখানে আয়াতটির সঠিক মানে হচ্ছে, "এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে।" অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, প্ররোচনা দান করার কাজ জিন শয়তানরাও করে আবার মানুষ শয়তানরাও করে। কাজেই এ সূরায় উভয়ের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এবং হাদীস থেকেও। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا –

"আর এভাবে আমি জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তারা পরস্পরের কাছে মনোমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।" (আল আন আম, ১১২)

আর হাদীসে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি নামায পড়েছো? আমি জবাব দিলাম, না। বললেন, ওঠো এবং নামায পড়ো! কাজেই আমি নামায পড়লাম এবং তারপর আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন ঃ

يَا اَبَاذَرٍّ تَعَوَّذْ بِا للّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ –

"হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়? বললেন, হাঁ।

---

www.icsbook.info